কবিতার ক্লাস

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

অরুণা প্রকাশনী : ৭ যুগলকিশোর দাস লেন : কলকাতা ৬

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ ১৩৬৭

প্রকাশিকা
অরুণা বাগচী
অরুণা প্রকাশনী
৭ যুগলকিশোর দাস লেন
কলকাতা ৬
প্রচ্ছদ
পূর্ণেন্দু পত্রী
মুদ্রাকর
আর রায়
সুব্রত প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৫১ ঝামাপুকুর লেন
কলকাতা ৯
বাঁধিয়েছেন
ডি-লাক্স বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
১৬ পাটোয়ার বাগান লেন
কলকাতা ৯

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন

শ্রদ্ধাস্পদেষু

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

'আনন্দবাজার পত্রিকা'র রবিবাসরীয় পৃষ্ঠায়, বছর কয়েক আগে, 'কবিকঙ্কণ' ছদ্মনামে এই ক্লাস খুলেছিলাম। ইচ্ছে ছিল, ছন্দের কয়েকটি মূল সূত্রকে—যতখানি সম্ভব—সহজ করে বুঝিয়ে বলব।...এটি আসলে ছন্দের ব্যাকরণ-বই নয়, সেই ব্যাকরণ সম্পর্কে পাঠকের ভয় কাটাবার বই। ভয় কাটাতে গিয়ে আমার আলোচনার প্রাথমিক স্তরে তো বটেই, অন্যত্রও মাঝে-মাঝে লঘু পরিহাসের ছোঁয়া লাগাতে হয়েছে। দিন কয়েকের ছুটি নিয়ে পুরীতে এসে সেই টুকরো-আলোচনাকে মোটামুটি সম্পূর্ণ একটি চেহারা দেওয়া গেল।

'কবিতার ক্লাস' যখন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল, অনেকেই তখন বিভাগীয় সম্পাদকের বরাবরে চিঠি লিখে এই আলোচনা সম্পর্কে আগ্রহ ও ঔৎসুক্য প্রকাশ করেছিলেন।...পত্রদাতাদের মধ্যে 'জিজ্ঞাসু পড়ুয়া', ডঃ ভবতোষ দত্ত ও কবি শ্রীশঙ্খ ঘোষের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।...

বিভিন্ন ছন্দ ও পদ্যবন্ধের দৃষ্টান্ত হিসাবে যে-সব ছড়া কিংবা টুকরো-কবিতা এ-বইয়ে ছড়িয়ে আছে, সেগুলি আমারই লেখা।...

এবারে প্রকাশ করা যেতে পারে, 'জিজ্ঞাসু পড়ুয়া' আর-কেউ নন, স্বয়ং শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন; কবিতার ক্লাসে তাঁকেও যে আমি 'পড়ুয়া' হিসেবে পেয়েছিলাম, এইটেই আমার সবচাইতে বড় গর্ব।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

খুব অল্প সময়ের মধ্যে এই বইয়ের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হয়েছে। এতটা আমার প্রত্যাশায় ছিল না। পাঠকদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি।

দ্বিতীয় সংস্করণে ইতস্তত ভাষার কিছু অদল-বদল করা হল।…

কলকাতা

ন. চ.

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'কবিতার ক্লাস'-এর তৃতীয় সংস্করণে 'সব ছন্দই কি সিলেবিক্' নামে নতুন একটি পরিচ্ছেদ যোগ করা হল।

কলকাতা

ন. চ.

চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা

এই সংস্করণে 'পদ ও যতি' নামে আরও একটি পরিচ্ছেদ যুক্ত হল।

কলকাতা

ন. চ.

পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকা

'পদ ও যতি' পরিচ্ছেদটি এই সংস্করণে পরিবর্ধিত হল। পরিচ্ছেদটির নূতন নামকরণ হল 'পদ, যতি ও যতিলোপ'।

কলকাতা

ন. চ.

ষষ্ঠ সংস্করণের ভূমিকা

এই সংস্করণে 'সংযোজন' নামে আরও একটি পরিচ্ছেদ যুক্ত হল।

ন. চ.

সূচীপত্র

লেখকের কবিতার বই

নীল নির্জন
অন্ধকার বারান্দা
প্রথম নায়ক
নীরক্ত করবী
নক্ষত্র জয়ের জন্য
কলকাতার যীশু
শ্রেষ্ঠ কবিতা
উলঙ্গ রাজা
খোলা মুঠি
কবিতার বদলে কবিতা
আজ সকালে
পাগলা ঘন্টি
ঘর-দুয়ার
রূপ-কাহিনী
সময় বড় কম
কবিতাসমগ্র (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)

প্রবন্ধের বই

কবিতার দিকে
কবিতার কী ও কেন

ছোটদের জন্য

সাদা বাঘ
গঙ্গা-যমুনা
শুরুর থেকে শুরু

কেউ কেউ কবি নয়, সকলেই কবি

এই বইয়ের নাম দিয়েছি 'কবিতার ক্লাস'। এতে চমকাবার কিছু নেই। অনেকে মনে করেন যে, কবিতা একটি অপার্থিব দিব্য বস্তু, এবং তাকে আয়ত্ত করবার জন্যে, মুনি-ঋষিদের মতো, নির্জন পাহাড়ে-পর্বতে কিংবা বনে-জঙ্গলে গিয়ে তপস্যা করতে হয়। আমি তা মনে করি না। আমার বিশ্বাস, জাতে যদিও একটু আলাদা, তবু কবিতাও আসলে সাংসারিক বিষয় ছাড়া আর কিছুই নয়, আমাদের এই সাংসারিক জীবনের মধ্যেই তার বিস্তর উপাদান ছড়িয়ে পড়ে আছে, এবং ইসকুল খুলে, ক্লাস নিয়ে, রুটিনমাফিক আমরা যেভাবে ইতিহাস কি ধারাপাত কি অঙ্ক শেখাই, ঠিক তেমনি করেই কবিতা লেখার কায়দাগুলো শিখিয়ে দেওয়া যায়। 'কায়দা' না-বলে অনেকে বলবেন 'কলাকৌশল', তা বলুন, কথাটা তার ফলে আর-একটু সম্ভ্রান্ত শোনাবে ঠিকই, কিন্তু মূল বক্তব্যের তাতে কোনও ইতর-বিশেষ হবে না। বিশ্বাস করুন চাই না-করুন, কবিতা লেখা সত্যিই এমন-কিছু কঠিন কাণ্ড নয়।

সেই তুলনায় পদ্য লেখা আরও সহজ। শুধু কায়দাগুলো রপ্ত করা চাই, ঘাঁতঘোঁত জেনে নেওয়া চাই। কবিতা আর পদ্যের তফাত কোথায়, এক্ষুনি সেই তর্কে ঢুকে ব্যাপারটাকে ঘোরালো করে তুলতে চাই না। তার চাইতে বরং জিজ্ঞেস করি, আপনার বয়েস যখন অল্প ছিল, তখন ছোট-পিসি কি ন-মাসি কি সেজদির বিয়ের সময় কি আপনার একখানা উপহার লিখবার ইচ্ছে হয়নি? হয়তো হয়েছিল। হয়তো ভেবেছিলেন, "বাঃ কী মজা, বাঃ কী মজা, খাব লুচি মণ্ডা গজা" ইত্যাদি সব উপাদেয় খাবার-দাবারের কথা দিয়ে লাইন-কয় লিখে তার-

পর "বিভুপদে এ-মিনতি—" জানাবেন যে, নবদম্পতি যেন চিরকাল সুখে থাকে।

কিন্তু, হায়, শেষ পর্যন্ত আর হয়তো কিছু লেখা হয়নি। হবে কী করে? 'মজা'র সঙ্গে 'গজা'র মিলটাই তখন মনে পড়েনি যে। আর তাই, কড়িকাঠের দিকে ঘণ্টাখানেক তাকিয়ে থেকে, এবং নতুন-কেনা মেড-ইন-ব্যাভেরিয়া পেনসিলের গোড়াটাকে চিবিয়ে ছাতু করে, শেষ পর্যন্ত হয়তো 'ধুত্তোর' বলে আপনি উঠে পড়েছিলেন। মনে-মনে খুব সম্ভব বলেছিলেন, "ও-সব উপহার-টুপহার লেখার চাইতে বরং মুদির দোকানের খাতা লেখা অনেক সহজ।"

মুদির দোকানের প্রসঙ্গে একটা পুরনো কথা মনে পড়ল। বছর পঞ্চাশেক আগেকার ঘটনা। আমার বয়েস তখন বছর দশেক। সেই সময়ে আঁক কষতে-কষতে শেলেটের উপরে আমি একটা পদ্য লিখে-ছিলুম। তার আরম্ভটা এইরকম :

আজ বড আনন্দ হইযাছে।
দেখিযাছি, রান্নাঘরে কই আছে।

অর্থাৎ আমি বলতে চেয়েছিলুম যে, মা যখন কইমাছ রান্না করছেন, তখন দুপুরের ভোজনপর্বটা বেশ জমাট হবে, সুতরাং আজ আমার বড়ই আনন্দের দিন। আনন্দ অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী হল না; এক জ্যাঠতুতো দাদা এসে চুলের মুঠি ধরে আমাকে শূন্যে তুলে ফেললেন, তারপর বাঁ-হাতে আমাকে শূন্যে ঝুলিয়ে রেখে ডান-হাতে একটা চড় কষালেন, তারপর, হাত পালটে, ডান-হাতে আমাকে শূন্যে ঝুলিয়ে রেখে বাঁ-হাতে একটা চড় কষালেন, তারপর বললেন, "হতচ্ছাড়া, তোমাকে আঁক কষতে দেওয়া হয়েছে, আর তুমি কিনা বসে-বসে কাব্যি করছ? এই আমি বলে রাখলুম, পরে তোমাকে মুদির দোকানের খাতা লিখে পেট চালাতে হবে।"

বাজে কথা। যে-ছেলে আঁক কষতে ভয় পায়, তার পক্ষে মুদির দোকানের খাতা লেখা সম্ভব নয়। চাল-ডাল-গোলমরিচ-জিরে-হলুদ-পাঁচফোড়নের হিসেব রাখা কি চাট্টিখানি ব্যাপার? সে-কাজ সকলে

পারে না। তার জন্যে সাফ মাথা চাই। সেই তুলনায় বরং কবিতা লেখা অনেক সহজ। কবিতা লেখবার জন্যে, আর যা-কিছুরই দরকার থাক, মাথাটাকে সাফ করবার কোনও দরকার নেই। বরং, সত্যি বলতে কী, মাথার মধ্যে একটু গোলমাল থাকলেই ভাল। কিন্তু না, মাথার প্রসঙ্গে এইখানেই ছেদ টানা যাক, কেননা বিশুদ্ধ আগমার্কা কবিরা হয়তো এই-টুকু শুনেই চোখ রাঙাতে শুরু করেছেন, বাকিটুকু শুনলে তাঁরা আমাকে আস্ত রাখবেন না। তার চাইতে বরং যে-কথা বলছিলুম, তা-ই বলি।

আমার বলবার কথাটা এই যে, অল্প-একটু চেষ্টা করলে যে-কেউ কবিতা লিখতে পারে। আমার মাসতুতো ভাইয়ের ছোট ছেলেটির কথাই ধরুন। গুণধর ছেলে। টুকলিফাই করেছে, পরীক্ষার হল-এ বোমা ফাটিয়েছে, গার্ডকে 'জান খেয়ে নেব' বলে শাসিয়েছে, উপরন্তু চাঁদা তুলে, মাইক বাজিয়ে, সরস্বতী পুজো করে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে তুষ্ট করেছে, তবু— এত রকম কাণ্ড করেও— স্কুল-ফাইনালের পাঁচিলটা সে টপকাতে পারেনি। তিনবার পরীক্ষা দিয়েছিল। তিনবারই ফেল। এখন সে আমাদের হাট-বাজার করে দেয়, হরিণঘাটার ডিপো থেকে দুধ আনে, পঞ্চাশ রকমের ফাই-ফরমাশ খাটে, এখানে-ওখানে ভুল-ইংরেজিতে চাকরির দরখাস্ত পাঠায়, এবং—

এবং কবিতা লেখে। তা সে-ও যদি কবি হতে পারে, তবে আপনি পারবেন না কেন?

আমার গিন্নির খুড়তুতো ভাই এক সওদাগরি অফিসের বড়বাবু। আগে সেও কবিতা লিখত, কিন্তু অফিসে তাই নিয়ে হাসাহাসি হওয়ায়, এবং বড়সাহেব তাকে একদিন চোখ পাকিয়ে "হোয়াট্স্ দিস্ আয়া'ম্ হিয়ারিং অ্যাবাউট য়ু" বলায়, কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়ে সে এখন গোয়েন্দা-গল্পের ভক্ত হয়েছে। তার কাছে সে-দিন একটা ইংরেজি বই দেখলুম। বইয়ের নাম 'বুচার্ বেকার্ মার্ডার মেকার্'। অর্থ অতি পরিষ্কার। যে-কেউ খুন করতে পারে। নৃশংস কসাইও পারে, আবার নিরীহ রুটিওয়ালাও পারে। খুন করবার জন্যে যে একটা আলাদা রকমের লোক হওয়া চাই, তা নয়।

তুলনাটা হয়তো একটু অস্বস্তিকর হয়ে যাচ্ছে, তবু বলি, কবিতার ব্যাপারেও তা-ই। কবিতা লিখবার জন্যে আলাদা রকমের মানুষ হবার দরকার নেই। রামা শ্যামা যদু মধু প্রত্যেকেই (ইচ্ছে করলে, এবং কায়দাগুলোকে একটু খেটেখুটে রপ্ত করে নিলে) ছন্দ ঠিক রেখে, লাইনের পর লাইন মিলিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিতে পারে।

তার জন্যে, বলাই বাহুল্য, কিছু জিনিস চাই, এবং কিছু জিনিস চাই না।

আগে বলি, কী কী চাই না।

(১) কবি হবার জন্যে লম্বা-লম্বা চুল রাখবার দরকার নেই। ওটা হিপি হবার শর্ত হতে পারে, কিন্তু কবি হবার শর্ত নয়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, চুল খুব ছোট করে ছেঁটেও কিংবা মাথা একেবারে ন্যাড়া করে ফেলেও কবিতা লেখা যায়। চুলের সঙ্গে বিদ্যুতের সম্পর্ক থাকলেও থাকতে পারে, কবিতার নেই।

(২) সর্বক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকবার দরকার নেই। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, মাটির দিকে তাকিয়েও কবিতা লেখা যায়। সবচাইতে ভাল হয়, যদি অন্য-কোনও দিকে না তাকিয়ে শুধু খাতার দিকে চোখ রাখেন।

(৩) কখন চাঁদ উঠবে, কিংবা মলয় সমীর বইবে, তার প্রতীক্ষায় থাকবার দরকার নেই। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, অমাবস্যার রাত্রেও কবিতা লেখা যায়, এবং মলয় সমীরের বদলে ফ্যানের হাওয়ায় কবিতা লিখলে তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না।

(৪) ঢোলা-হাতা পাঞ্জাবি পরবার দরকার নেই। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, স্যানডো-গেঞ্জি গায়ে দিয়েও, কিংবা একেবারে আদুর গায়েও, কবিতা লেখা সম্ভব।

এইবারে বলি, কবিতা লিখতে হলে কী কী চাই।

বিশেষ কিছুই চাই না। দরকার শুধু—

(১) কিছু কাগজ (লাইন-টানা হলেও চলে, না-হলেও চলে)।

(২) একটি কলম (যে-কোনও শস্তা কলম হলেও চলবে) অথবা একটি পেনসিল। এবং

(৩) কিছু সময়।

কিন্তু এত সব কথা আমি বলছি কেন? কবিতার কৌশলগুলিকে সর্বজনের হাতের মুঠোয় এনে না-দিয়ে কি আমার তৃপ্তি নেই? সত্যিই নেই! ইংরেজিতে 'পোয়্ট্রি ফর দি কমন ম্যান' বলে একটা কথা আছে। আমার ইচ্ছে, কমন ম্যানদেরও আমি পোয়্ট বানিয়ে ছাড়ব। পরশু-রামের কথা মনে পড়ছে। তাঁর প্রতিজ্ঞা ছিল, পৃথিবীকে একেবারে নিঃক্ষত্রিয় করে ছাড়বেন। কিন্তু, না-পারবার হেতুটা যা-ই হোক, কাজটা তিনি পারতে-পারতেও পারেননি। বিশ্ব-সংসারকে যাঁরা নিষ্কবি করে ছাড়তে চান (অনেকেই চান), তাঁরাও সম্ভবত শেষ পর্যন্ত পেরে উঠবেন না।

আমার প্রতিজ্ঞাটা অন্য রকমের। আমি ঠিক করেছি, বাংলা দেশে সব্বাইকে আমি কবি বানাব। দেখি, পারি কি না।

কবিতা লিখবার জন্যে কী কী চাই, তা তো একটু আগেই বলেছি। চাই কাগজ, চাই কলম (কিংবা পেনসিল), চাই সময়। তা আশা করি, কাগজ-কলম আপনারা যোগাড় করতে পেরেছেন। বাকি রইল সময়। তাও নিশ্চয়ই আপনাদের আছে। রেশনের দোকানে লাইন না-লাগিয়ে, এই যে আপনারা গুটিগুটি 'কবিতার ক্লাস'-এ এসে হাজির হয়েছেন, এতেই বুঝতে পারছি যে, সময়ের বিশেষ অভাব আপনাদের নেই।

সুতরাং 'দুর্গা দুর্গা' বলে শুরু করা যাক। অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু।

আগেই বলি, কবিতার মধ্যে তিনটি জিনিস থাকা চাই। কাব্যগুণ, ছন্দ, মিল।

বিনা ডিমে যেমন ওমলেট হয় না, তেমনি কাব্যগুণ না থাকলে কবিতা হয় না। তার প্রমাণ হিসেবে, আসুন, আমার সেই মাসতুতো ভাইয়ের ছোট ছেলের লেখা চারটে লাইন শোনাই :

সূর্য ব্যাটা বুর্জোয়া যে,
দুর্যোধনের ভাই।
গর্জনে তার তূর্য বাজে,
তর্জনে ভয় পাই।

বলা বাহুল্য, এটা কবিতা হয়নি। তার কারণ, ছন্দ আর মিলের দিকটা ঠিকঠাক আছে বটে, কিন্তু কাব্যগুণ এখানে আদপেই নেই। এবং কাব্যগুণ না-থাকায় দেখা যাচ্ছে ব্যাপারটা নেহাতই বাক্যের ব্যায়াম হয়ে উঠেছে।

এবারে মিলের কথায় আসা যাক। মিল না-রেখে যে কবিতা লেখা যায় না, তা অবশ্য নয়, তবু যে আমি মিলের উপরে এত জোর দিচ্ছি, তার কারণ :

(১) প্রথমেই যদি আপনি মিল ছাড়া কবিতা লিখতে শুরু করেন, তা হলে অনেকেই সন্দেহ করবে যে, মিল-এ সুবিধে হয়নি বলেই আপনি অ-মিলের লাইনে এসেছেন। সেটা খুবই অপমানের ব্যাপার।

(২) মিল জিনিসটাকে প্রথম অবস্থায় বেশ ভাল করে দখল করা চাই। তবেই সেটাকে ছেড়ে দিয়েও পরে ভাল কবিতা লেখা সম্ভব হবে। যেমন বড়-বড় লিখিয়েদের মধ্যে অনেকেই অনেক সময় ব্যাকরণের গণ্ডির বাইরে পা বাড়িয়েও চমৎকার লেখেন, এও ঠিক তেমনি। ব্যাকরণ বস্তুটাকে প্রথমে বেশ ভাল করে মান্য করা চাই, তবেই পরে সেটাকে দরকারমতো অমান্য করা যায়। ঠিক তেমনি, পরে যাতে মিলের বেড়া ভাঙা সহজ হয়, তারই জন্যে প্রথম দিকে মিলটাকে বেশ আচ্ছা করে রপ্ত করতে হবে।

ছন্দ কিন্তু সব সময়েই চাই। আগেও চাই, পরেও চাই। আসলে আমার ক্লাসে আমি ছন্দের কথাই বলব। সেই বিচারে 'কবিতার ক্লাস' না-বলে একে 'ছন্দের ক্লাস'ও বলা যেতে পারত। তাতে কিছু ক্ষতি ছিল না।

শিল্পকলায়, চলায়, বলায় সব-কিছুতেই ছন্দ

আমরা বলেছি যে, কবিতায় মিল থাক্ আর না-ই থাক্, ছন্দ সর্বদা চাই। আগেও চাই, পরেও চাই। এখন কথা হচ্ছে, ছন্দ বস্তুটা কী। ওটা আর কিছুই নয়, কবিতার শরীরে দোলা লাগাবার কায়দা। তা নানান দোলায় কবিতার শরীরকে দোলানো যায়। ছন্দ তাই নানা রকমের।

কিন্তু 'কবিতার ছন্দ' নিয়ে আলোচনার আগে বরং মোটামুটিভাবে ছন্দ জিনিসটা নিয়েই কিছু বলা যাক।

ছন্দ বস্তুটা কী? আমরা যখন বলি, কমলের চেহারায় না আছে ছিরি না আছে ছাঁদ, তখন তার দ্বারা আমরা কী বোঝাতে চাই? এই-টেই তো বোঝাতে চাই যে, কমলের চেহারা একে বিচ্ছিরি তায় বেঢপ। তাই না? (ছাঁদ কথাটা ছন্দ থেকেই এসেছে।) তা হলেই দেখা যাচ্ছে, যেমন কবিতার চেহারায়, তেমনি মানুষের চেহারাতেও ছন্দ থাকা চাই।

মজা এই যে, ছন্দ না-থাকাটাও এক রকমের ছন্দ। কবিতায় না হোক, অন্য সব ব্যাপারে।

বড় রাস্তা দিয়ে ভীমবেগে এইমাত্র একটা লরি চলে গেল। তার ওই ভীমবেগে যাওয়ার একটা ছন্দ আছে। লরি আসছে দেখবামাত্র দুটি লোক রাস্তা থেকে লম্ফ দিয়ে ফুটপাতে উঠে পড়লেন। তাঁদের ওই লম্ফ দিয়ে ফুটপাতে উঠবারও একটা ছন্দ আছে। ফুটপাতে উঠে তাঁদের একজন, যেন কিছুই হয়নি এইভাবে, একটা বিড়ি ধরালেন।

তার একটা ছন্দ আছে। অন্যজন, তখনও তাঁর ভয় কাটেনি, ঝাড়া তিন মিনিট চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারও একটা ছন্দ আছে।

ছন্দ আছে সব-কিছুতেই। নাতিবিখ্যাত কিন্তু অতিশক্তিমান এক বাঙালি প্রাবন্ধিকের লেখায় দুই ভদ্রলোকের প্রাতঃকালীন ভ্রমণের বর্ণনা দেখেছি। একজন মোটা, অন্যজন রোগা। একজন ঘোঁতঘোঁত করে হাঁটেন, অন্যজন পন্‌পন্‌ করে হাঁটেন। এই দুই রকমের হাঁটারই ছন্দ আছে।

আলোচনাকে এবারে কিছুটা উচ্চস্তরে উঠিয়ে আনি। রবীন্দ্রকাব্যের নায়িকা মাকে জিজ্ঞেস করছেন, "কী ছাঁদে কবরী বাঁধি লব আজ"। কেউ জানে না, শেষ পর্যন্ত তিনি কোন্‌ কায়দায় খোঁপা বেঁধেছিলেন। কিন্তু যে-কায়দাতেই বাঁধুন, তাতে ছন্দ নিশ্চয়ই ছিল। ছন্দ যেমন টান-খোঁপাতে আছে, তেমনি এলো-খোঁপাতেও আছে। চুড়ো-খোঁপাতেও আছে, আবার লতানে-খোঁপাতেও আছে।

ছন্দ আছে সর্বত্র। কুঁড়েঘরেও আছে, আবার আকাশ-ছোঁয়া অট্টালিকাতেও আছে। গৃহিণীর চাঁদপানা মুখেও আছে, আবার পাওনাদারের হাঁড়িপানা মুখেও আছে। চেয়ারে বসে ফাইল সই করাতেও আছে, আবার ঘাম ঝরিয়ে মোট বওয়াতেও আছে। আজ সকাল থেকে এলোমেলো হাওয়া দিচ্ছে। এর একটা ছন্দ আছে। আবার হাওয়া যখন মরে যাবে, এবং গাছের পাতাটি পর্যন্ত নড়বে না, তখন তারও একটা ছন্দ থাকবে। চোখের সামনে আমরা যা-কিছু দেখি, যা-কিছু শুনি, তার সব-কিছুতেই—সমস্ত চলায়, সমস্ত বলায়, সব রকমের কাজে কিংবা অকাজে—ছন্দ রয়েছে। ছন্দ মানে এখানে ঢং কিংবা ডৌল কিংবা রীতি। সেটা কোথায় নেই?

এ-বাড়ির গিন্নি বলেন, ও-বাড়ির নতুন বউয়ের চলনে নেই। কিন্তু সেটা রাগের কথা। আসলে ও-বাড়ির নতুন বউয়ের চলনেও একটা ছন্দ আছে ঠিকই, তবে কিনা এ-বাড়ির গিন্নির সেটা ভাল ঠেকছে না।

যা বলছিলুম। গাড়ি, বাড়ি, চলা, বলা, মাঠ, নদী, মেঘ, পাহাড়—সব-কিছুরই একটা-না-একটা ছন্দ আছে। আছে কবিতারও। কিন্তু

কবিতার ছন্দ বলতে যে-কোনো রকমের একটা ছাঁদ বোঝায় না। সেও একরকমের ছাঁদই, তবে কিনা তার নিজস্ব কতকগুলি নিয়মকানুন থাকে। মুখে আমরা যে-সব কথা বলি, তাকে যদি সেই নিয়মকানুনের মধ্যে বেঁধে ফেলতে পারতুম, মুখের কথাও তা হলে কবিতা হয়ে উঠত।

বেঁধে ফেলার প্রস্তাব শুনেই বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, ছন্দ একরকমের বন্ধন। কথাকে যা কিনা নিয়মের মধ্যে বাঁধে। কিন্তু আর-এক দিক থেকে দেখতে গেলে, ঠিক বন্ধনও এটা নয়। রবীন্দ্রনাথ একে সেই দিক থেকেই দেখেছেন। তিনি বলেছেন, "এ কেবল বাইরে বাঁধন, অন্তরে মুক্তি। কথাকে তার জড়ধর্ম থেকে মুক্তি দেবার জন্যেই ছন্দ।"

শুনে অনেকের ধাঁধা লাগতে পারে। বন্ধন কীভাবে মুক্তির পথ খুলে দেয়, সেই জটিল তত্ত্বটাকে সহজে বুঝিয়ে বলবার জন্যে রবীন্দ্রনাথ তাই সেতারের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। সুরকে ভালভাবে মুক্তি দেবার জন্যেই তো সেতারের তারগুলিকে টান করে বেঁধে নিতে হয়। এও সেই ব্যাপার। কথাকে যদি না ছন্দে বাঁধি, তার অন্তরের সুর তা হলে ভাল করে মুক্তি পায় না।

ছন্দ আসলে কথার মধ্যে গতির তাড়া জাগিয়ে দেয়। আর এই গতির তাড়া জেগে উঠলেই আমরা দেখতে পাব যে, এমনিতে যাকে হয়তো খুবই সহজ কথা বলে মনে হয়, তারও চেহারা কেমন পালটে গিয়েছে; আমাদের আটপৌরে কথাগুলিও তখন আশ্চর্য এক রহস্যের ছোঁয়ায় কেমন যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে।

একটা দৃষ্টান্ত দিই।

ধরা যাক, আমাদের বলবার কথাটা এই যে, সারাটা দিন যা-হোক কোনোক্রমে কেটে গেছে, কিন্তু বিকেলটা আর কাটতে চাইছে না। এমন কথা তো আমরা কতদিনই বলি। বলবার সঙ্গে-সঙ্গেই তা ফুরিয়েও যায়। কিন্তু এই কথাটাকেই রবীন্দ্রনাথ যখন ছন্দে বেঁধে বলেছেন, তখন স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি যে, বলবার পরেও তার রেশ ফুরিয়ে যাচ্ছে না। সামান্য ওই কয়েকটি কথার মধ্যেই উদাস একটি বেদনার গতি এমন আশ্চর্যভাবে সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছে যে, শব্দগুলিকে

সেই গতিই যেন ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। শ্রোতার অন্তরে বার-বার গুঞ্জরিত হয়ে উঠছে একটি শব্দমালা :

"সকল বেলা কাটিয়া গেল
বিকাল নাহি যায়।"

রবীন্দ্রনাথ, বলাই বাহুল্য, গদ্যেও এই কথাগুলিকে খুবই মর্মগ্রাহী করে বলতে পারতেন। কিন্তু ছন্দের বাঁধনে এইভাবে না বাঁধলে, কথাগুলির মধ্যে একটি বেদনার গতিকে হয়তো এতটাই মোক্ষমভাবে জাগিয়ে তোলা যেত না। এ যেন কথার নেপথ্য থেকে একটি দীর্ঘশ্বাসও বেশ স্পষ্ট করে শুনতে পাওয়া গেল।

শুধু বেদনার কথা কেন, ফুর্তির কথাকেও ছন্দে বেঁধে চঞ্চল করে তোলা যায়। শুনে, শ্রোতার মনও হঠাৎ কেমন চন্‌মন্‌ করে ওঠে।

কথা এই যে, ছন্দ এক রকমের নয়। আবার একই ছন্দের মূল কাঠামোর মধ্যে নানান রকমের বৈচিত্র্যের খেলা দেখানো যেতে পারে। সেটা অবশ্য পরের কথা। তার আগে মূল ছন্দগুলির পরিচয় জানা চাই।

বাংলা কবিতার তিন ছন্দ

রবিবার সকাল। আপিসের তাড়া নেই। চুপচাপ বিছানায় শুয়ে, চোখ বুজে, তাই ছন্দ-ভাবনায় মগ্ন হয়ে ছিলুম। ভাবছিলুম যে, বাংলা কবিতা মোটামুটি তিন রকমের ছন্দে লেখা হয় :

(১) অক্ষরবৃত্ত। (২) মাত্রাবৃত্ত। (৩) স্বরবৃত্ত।

বাংলা ছন্দের এই নাম নিয়ে অবশ্য আপত্তি উঠেছে। আপত্তির যে কারণ নেই, তাও নয়। কিন্তু…

চিন্তায় বাধা পড়ল। অন্নচিন্তা চমৎকারা। সুতরাং চক্ষু বুজে কাব্য-চিন্তায় মগ্ন হওয়া অসম্ভব। (আমি আগেই আভাস দিয়েছি যে, আমাদের বাড়িতে প্রত্যেকেই কবি। ইস্তক আমার ভৃত্যটিও, কাজ না করুক, চমৎকার ছড়া মেলায়।) কানের কাছে হঠাৎ ঝংকার উঠল :

কর্মের বেলায় ঢুঢু, শুধু নিদ্রা দাও!
ওঠো বাবু কুম্ভকর্ণ, বাজারেতে যাও।

গৃহিণীর কণ্ঠ! আমি যে ছন্দ নিয়ে চিন্তা করছি, তা তিনি বুঝতে পারেননি। ভেবেছেন, স্রেফ ফাঁকি দেবার জন্যে মট্‌কা মেরে শুয়ে আছি। বলা বাহুল্য, তাঁর কাব্যের মধ্যে যে একটা গঞ্জনার ব্যঞ্জনা ছিল, সেটা আমার আদপেই ভাল লাগেনি; 'কুম্ভকর্ণ'-সম্বোধনটা তো রীতিমত আপত্তিকর মনে হল। তবু গুণগ্রাহী মানুষ বলেই তাঁর সহজাত কাব্যপ্রতিভায় আমি মুগ্ধ হলুম।

বিছানা ছেড়ে তক্ষুনি অবশ্য উঠলুম না। কিন্তু শুয়ে থাকবারই বা উপায় কী। খানিক বাদেই আমার আট বছরের নাতিটি এসে চেঁচাতে লাগল :

ছক্কলে ডেকে ডেকে হদ্দ হল যে,
এক্ষুনি ওঠো, যাও খাদ্যের খোঁজে।

এর পরে আর শুয়ে থাকা চলে না। থলি নিয়ে বাজারের পথে রওনা হতে হল। ফিরতি পথে একবার মুদির দোকানে যাবার দরকার ছিল। কিন্তু যাওয়া হল না। না-যাওয়ার হেতুটা অতিশয় প্রাঞ্জল। গত মাসের বিল অদ্যাবধি শোধ করা হয়নি, এবং আমি শ্রীকবিকঙ্কণ সরখেল যে একজন পুরোদস্তুর কবি, এই কথাটা বিলক্ষণ জানা সত্ত্বেও গতকাল মুদি আমাকে ধারে এক-কিলো বাদাম-তেল দিতে আপত্তি করেছিল। শুধু তাই নয়, তার বিল আপাতত মেটানো হবে না শুনেই সর্বসমক্ষে সে আমার তেলের বোয়মটা ফিরিয়ে দিয়ে বলেছিল, "যান যান মশাই, কবিকে তেল দেওয়া আমার কম্ম নয়।"

কথাটা মনে পড়ে যেতেই মুদির দোকানের সান্নিধ্য বর্জন করে আমি অন্য পথে বাড়ি ফিরলুম। ফিরেই বুঝলুম, বাড়িতে তেল না থাক, ঘি আছে, এবং প্রাতরাশের জন্যে লুচি ভাজবার আয়োজন হচ্ছে। রাঁধুনি বামনিকে তো আমার কন্যার উদ্দেশে স্পষ্টই বলতে শোনা গেল :

দিদি আস্থন, ময়দা ঠাস্থন,
আজকে রবিবার।
মোহনভোগের সঙ্গে লুচি
জমবে চমৎকার।

শুনে আমি যৎপরোনাস্তি প্রীত হলুম। তার কারণ নেহাত এই নয় যে, বাড়িতে লুচি হলে আমিও তার ভাগ পাব। বলা বাহুল্য, সেটাও একটা কারণ বটে, তবে আমার আনন্দের প্রধান কারণটা এই যে, আজ সকালে ঘুম ভাঙবার পর, মাত্র ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই, বাংলা কবিতার প্রধান তিনটি ছন্দের নমুনা আমি পেয়ে গিয়েছি।

এখন দেখা যাক, একই কথাকে নানান রকমের ছন্দে আমরা বাঁধতে পারি কি না।

না না, আর ওই হাট-বাজার-তেল-ঘি-কয়লা-কেরোসিন নয়; আস্থন, কবিদের যা কিনা খুবই প্রিয় প্রসঙ্গ, সেই পূর্ণিমার চাঁদ নিয়ে কিছু লিখি। ধরা যাক, আমাদের বলবার কথাটা এই যে, শ্রাবণ মাসের আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে, আর সেই গোল চাঁদকে একটা

সোনার থালার মতো দেখাচ্ছে। এখন এই কথাগুলিকে যদি ছন্দে বেঁধে বলতে হয়, তো আমরা কী ভাবে বলব? প্রথমত এই ভাবে বলতে পারি :

দ্যাখো ওই পূর্ণচন্দ্র শ্রাবণ-আকাশে,
স্বর্ণের পাত্রটি যেন শূন্য 'পরে ভাসে।

এ হল অক্ষরবৃত্ত ছন্দ। (পরবর্তী কালে শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় এর নাম দিয়েছেন 'মিশ্রকলাবৃত্ত'। আর শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই ছন্দকে বলেন 'তানপ্রধান'।) শ্রাবণ মাসের মেঘাচ্ছন্ন আকাশে পূর্ণচন্দ্র আদৌ দেখা সম্ভব কি না, এক্ষুনি সেই কূট-কচালে তর্ক তুলে লাভ নেই ; তার চাইতে বরং ভাবা যাক, অক্ষরবৃত্ত ছন্দের মধ্যে আমাদের বক্তব্যের সুর কি ঠিকমতো বেজে উঠল? যদি মনে হয়, বাজেনি, তো এই একই বক্তব্যকে আমরা অন্য ছাঁদেও বাঁধতে পারি। ছন্দ পালটে লিখতে পারি :

আকাশে ছড়ায় পূর্ণচাঁদের বাণী
শ্রাবণ-রাত্রি হাসে।
দেখে মনে হয়, স্বর্ণপাত্রখানি
নীল সমুদ্রে ভাসে।

এ হল মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। (শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন এর নতুন নাম দিয়েছেন 'কলাবৃত্ত'। আর শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায় একেই বলেন 'ধ্বনিপ্রধান' ছন্দ।) লাইনগুলি আর-একবার পড়ে দেখুন ; ঠিক বুঝতে পারবেন যে, এর দোলাটা একেবারে অন্য রকমের। এতক্ষণ যেন শান্ত জলে নৌকো চলছিল, এবার ঢেউয়ের দোলায় উঠছে নামছে। এই দোলাটা কি ভাল লাগছে আপনাদের? নাকি মনে হচ্ছে যে, এও যেন ঠিক মনের মতো হল না? বেশ তো, তা হলে আসুন, আমাদের কথাগুলিকে এবারে আর-একরকমের ছন্দে দুলিয়ে দেওয়া যাক। লেখা যাক :

দ্যাখো দ্যাখো আজকে যেন
শ্রাবণ-পূর্ণিমায়
সোনার থালা আটকে আছে
নীল আকাশের গায়।

বলেন তানপ্রধান ছন্দ। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনও মনে করেন যে, অক্ষর-বৃত্ত নামের মধ্যে এই ছন্দের চরিত্র-পরিচয় ঠিক ধরা পড়েনি। সেই কারণেই পরবর্তী কালে অক্ষরবৃত্ত নামটি তিনি বর্জন করেছেন, এবং এর নতুন নাম দিয়েছেন মিশ্রকলাবৃত্ত। কিন্তু নামাবলী নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। নামের মূল্য নামমাত্র। আর তা ছাড়া, মহাকবি শেক্‌সপিয়র তো বলেই দিয়েছেন, গোলাপকে যে-নামেই ডাকো, তার গন্ধের তাতে তারতম্য ঘটবে না। সব ব্যাপারেই তাই। আর তাই, অন্যান্য নামের গণ্ডগোলে না-ঢুকে, আপাতত ওই অক্ষরবৃত্ত নামটাই ব্যবহার করা যাক। তাতে কাজের অনেক সুবিধে হবে।

এইখানে বলে রাখি, বয়সের বিচারে অক্ষরবৃত্ত খুবই বনেদি ছন্দ। রবীন্দ্রনাথের আগে পর্যন্ত, এমন কী রবীন্দ্রকাব্যেরও সূচনাপর্বে, বাংলা কবিতা প্রধানত অক্ষরবৃত্তেই লেখা হয়েছে। কিন্তু এর থেকে আবার এমন কথা কেউ যেন ভেবে না বসেন যে, অক্ষরবৃত্ত নেহাতই সাবেক-কালের ছন্দ, একালে আর তার চলন কিংবা কদর নেই। না, তা নয়। বরং, সত্যি বলতে কী, হাল আমলের কবিতায় দেখছি অক্ষরবৃত্ত আবার নতুন করে আসর জাঁকিয়ে বসেছে।

অক্ষরবৃত্তের লক্ষণ কী? লক্ষণ মোটামুটি এই যে, এ-ছন্দে যত অক্ষর বা বর্ণ, তত মাত্রা। অর্থাৎ কিনা প্রতিটি অক্ষরই এখানে একটি মাত্রার মর্যাদা পেয়ে থাকে। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :

(১) গোলোক বৈকুণ্ঠপুরী/সবার উপর
(২) দ্যাখো চারু/যুগ্মভুরু/ললাট প্রসর
(৩) শ্যামল সুন্দর প্রভু কমললোচন
(৪) গুণ হৈয়া দোষ হৈল বিদ্যার বিদ্যায়
(৫) নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য রতন
(৬) পোড়া প্রণয়ের বুঝি জরামৃত্যু নাই
(৭) কাঁপে তারা কাঁপে উরু গুরুগুরু করি
(৮) চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির
(৯) ওষ্ঠাধরে বিম্বফল লজ্জা নাহি পায়

(১০) বঙ্গভূমি পদে দলে তুরুস্ক সোয়ার

বাংলা কাব্যের মহাসমুদ্রে ডুব দিয়ে, যেমন-যেমন হাতে মিলল, দশ-দশটি পংক্তি তুলে নিয়ে এলুম। এদের প্রত্যেকের ছন্দ অক্ষরবৃত্ত। প্রত্যেক পংক্তিতে অক্ষরের সংখ্যাও যেমন চোদ্দ, মাত্রার সংখ্যাও তেমনি চোদ্দ। তার মানে এই নয় যে, অক্ষরবৃত্ত ছন্দের কবিতার এক-একটি পংক্তিতে ঠিক চোদ্দটা অক্ষরই থাকতে হবে। না, তা নয়। তবে, অক্ষরের সংখ্যা বাড়লে কিংবা কমে গেলে মাত্রার সংখ্যাও সেই সঙ্গে বাড়বে কিংবা কমে যাবে। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে, পংক্তির মাপ বাড়ুক কিংবা কমুক, অক্ষর আর মাত্রার সংখ্যা সমান-সমানই রইল।

কথা এই যে, অক্ষরবৃত্তের পংক্তিকে বাড়ানো-কমানো যায় ঠিকই, কিন্তু নেহাতই খেয়াল-খুশিমতো বাড়ানো-কমানো যায় না। অর্থাৎ হ্রাস-বৃদ্ধির একটা কানুন আছে, সেই কানুন মেনে তবেই লাইনটাকে বাড়ানো-কমানো চলে। কিন্তু সে-কথায় একটু বাদে ঢুকব। তার আগে জানা দরকার, এত যে মাত্রা মাত্রা করছি, সেই মাত্রা জিনিসটা কী?

আমরা কথায় বলি, অমুক লোকটার মাত্রাজ্ঞান আছে, তমুক লোক-টার নেই। ইংরেজিতে একেই বলে সেন্‌স্ অব প্রোপোরশান। প্রোপোরশানের বাংলা অর্থ অনুপাত। মাত্রা বলতে কি তা হলে অনু-পাত বুঝব?

না, মহাশয়, কবিতায় ঠিক এই অর্থে 'মাত্রা' কথাটার ব্যবহার হয় না। তবে কোন্ অর্থে হয়?

জানি, আমার কপালে দুঃখ আছে, ছান্দসিকদের কাছে ধমক আমাকে খেতেই হবে। কিন্তু উপায় কী, বিজ্ঞজনেরা যতই চোখ রাঙিয়ে আমাকে ভর্ৎসনা করুন, মাত্রা বোঝাতে গিয়ে কোনও গুরুগম্ভীর জটিল ব্যাখ্যার অবতারণা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি আমার ক্লাস খুলেছি নতুন-পড়ুয়াদের নিয়ে, 'ব্যাঘ্র মানে শার্দূল' শুনলেই তাঁরা ঘাবড়ে গিয়ে ক্লাস ছেড়ে পালাবেন। তাই, কিছুটা ত্রুটির ঝুঁকি নিয়েও, খুব সহজ করে ব্যাপারটা তাঁদের বুঝিয়ে দিতে চাই। আপাতত, প্রবোধচন্দ্রের

ব্যাখ্যা অনুযায়ী, এইটুকু বুঝলেই তাঁদের কাজ চলবে যে, “যার দ্বারা কোনো কিছুর পরিমাপ করা যায়”, তাকেই আমরা মাত্রা বলে থাকি। প্রবোধচন্দ্র বলেছেন, “মাত্রা মানে পরিমাপক”, অর্থাৎ ইউনিট অব মেজার। এখন, বলা বাহুল্য, বস্তুভেদে ওই পরিমাপের ইউনিটও আলাদা হতে পারে, হয়ে থাকে। জল মাপবার ইউনিট যদি ফোঁটা, তো কাপড় মাপবার ইউনিট হয়তো মিটার কিংবা গজ। ইউনিটের এই বিভিন্নতার ব্যাপারটা প্রবোধচন্দ্র নিজেই ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়ে বলেছেন যে, ছন্দের রীতিভেদেও মাত্রা বিভিন্ন হয়। যাই হোক, আমার পড়ুয়ারা মোটামুটি এইটুকু জেনে রাখুন যে, কবিতার এক-একটি পংক্তির মধ্যে যে ধ্বনিপ্রবাহ থাকে, এবং তাকে উচ্চারণ করার জন্য মোট যে সময় আমরা নিয়ে থাকি, সেই উচ্চারণকালের ক্ষুদ্রতম এক-একটা অংশই হল মাত্রা। প্রবোধচন্দ্র তারই নাম দিয়েছেন ‘কলা’। ‘কলা’ মানে এখানে অংশ। যেমন ষোল-কলায় চাঁদ পূর্ণ হয়, তেমনি কলা কিংবা মাত্রার সমষ্টি দিয়ে তৈরি হয় পূর্ণ এক-একটি পংক্তির উচ্চারণকাল।

ব্যাপারটাকে এবারে হাতে-কলমে পরীক্ষা করে দেখা যাক। ‘গোলোক বৈকুণ্ঠপুরী সবার উপর’—এই লাইনটিকে একবার চেঁচিয়ে উচ্চারণ করুন তো। করেছেন? করতে যে সময় লাগল, সেই উচ্চারণ-কাল মোট চোদ্দটি মাত্রার সমষ্টি। অর্থাৎ এই মাত্রাগুলি হচ্ছে লাইনটির উচ্চারণকালের ক্ষুদ্রতম এক-একটি অংশ। মোট মাত্রা এখানে চোদ্দ। আবার লাইনটির মোট অক্ষরের সংখ্যাও তা-ই।

কিন্তু অক্ষর আর মাত্রাকে এইভাবে তুল্যমূল্য করে দেখার একটা বিপদ আছে। যথা ‘ঐ’ দৃশ্যত একটিই অক্ষর বটে, কিন্তু তাকে ভেঙে ‘ওই’ লিখলেই অক্ষরের সংখ্যা দুয়ে গিয়ে দাঁড়ায়। অথচ ‘ঐ’ আর ‘ওই’য়ের উচ্চারণ তো একই। ফলে, অক্ষরবৃত্তে কেউ যদি ‘ঐ’ লিখে ওই একাক্ষর দিয়ে দু-মাত্রার কাজ চালান, তাঁকে দোষ দেওয়া যাবে না। ‘বউ’ আর ‘বৌ’য়ের ক্ষেত্রেও সেই একই ব্যাপার। ‘হাওয়া’, ‘পাওয়া’, ‘খাওয়া’, ইত্যাদির বেলাতেও অক্ষর আর মাত্রাকে সংখ্যার ব্যাপারে তুল্যমূল্য করে দেখবার উপায় নেই। ও-সব শব্দের ‘ওয়া’-

অংশে যদিও দুটি অক্ষর, কার্যত সেই অক্ষর দুটি কিন্তু এক মাত্রার বেশি দাম পায় না।

তা ছাড়া আমরা চার-অক্ষরের সমবায়ে লিখি 'তোমারই' 'আমারই', কিন্তু উচ্চারণ করি 'তোমারি' 'আমারি'; তিন-অক্ষরের সমবায়ে লিখি 'সবই', কিন্তু উচ্চারণ করি 'সবি'—ধ্বনির আয়তনের বিচারে দু-অক্ষরের 'ছবি'র সঙ্গে তার ফারাক থাকে না। পরে আমরা দেখিয়ে দেব যে, অক্ষর দেখে মাত্রা গুনতে গেলে আরও নানা বিপদ ঘটতে পারে। আপাতত এইটুকু জেনে রাখুন যে, ছন্দের ব্যাপারে আসলে ধ্বনিটাই প্রধান কথা, অক্ষরটা নয়। তবু ছন্দশিক্ষার প্রাথমিক পর্বে (অর্থাৎ মাত্রা ইত্যাদির সঙ্গে যখন পরিচয় ঘটেনি, তখন) অক্ষরের ভিত্তিতে ছন্দ চেনাবার চেষ্টা করেছি এই জন্যে যে, নতুন পড়ুয়ার তাতে সুবিধে হয়। সেই প্রাথমিক পর্ব তো চুকেছে; এখন বলি, অক্ষরের উপর চোখ না-রেখে ধ্বনির দিকে কান রাখুন। ছন্দ-নির্ণয় আর মাত্রা-বিচার তাতেই নির্ভুল হবে।

এবারে তা হলে লাইনের দৈর্ঘ্যের হ্রাস-বৃদ্ধির প্রসঙ্গে যাওয়া যাক। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের নমুনা দিতে গিয়ে ইতিপূর্বে আমি যেসব লাইন তুলে দিয়েছিলুম, তার প্রত্যেকটিই চোদ্দ মাত্রার লাইন। এবারে বলি, এ-ছন্দে ছ মাত্রার লাইন লেখা যায়, দশ মাত্রার লাইন লেখা যায়, চোদ্দ মাত্রার লাইন লেখা যায়, আঠারো মাত্রার লাইন লেখা যায়, বাইশ মাত্রার লাইন লেখা যায়, ছাব্বিশ মাত্রার লাইন লেখা যায়—এমন কী, তিরিশ মাত্রার লাইনও আমি দেখেছি। তার বেশি বাড়াতে হলে চৌত্রিশ মাত্রায় যেতে হয়। কেউ গিয়েছেন বলে আমি জানিনে।

হ্রাসবৃদ্ধির কানুনটা তাহলে কী? এখনও সেটা বুঝতে পারেননি? ছয়, দশ, চোদ্দ, আঠারো, বাইশ—মাত্রার সংখ্যা কীভাবে বাড়ছে দেখুন। লোকে বলে চড়্‌চড়্‌ করে বেড়ে যাওয়া, এখানে চারচার করে বাড়ছে। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের চাল আসলে চার মাত্রার চাল। মূলে রয়েছে চার। তার সঙ্গে, কিংবা চারের যে-কোনও গুণিতকের সঙ্গে (অর্থাৎ চার-দুগুনে আটের সঙ্গে, কিংবা তিন-চারে বারোর সঙ্গে, কিংবা চার-চারে ষোলোর

সঙ্গে, কিংবা চার-পাঁচে কুড়ির সঙ্গে) দুই যোগ করলে যে-সংখ্যাটা মিলবে, তত সংখ্যার মাত্রা দিয়েই অক্ষরবৃত্তের লাইন তৈরি করা যায়। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :

লক্ষ ঢাক।ঢোল
বাজিছে হো।থায়।
চক্ষু হয় ।গোল,
লোকে মূর্ছা ।যায়।

এ হল ৪+২=৬ মাত্রার অক্ষরবৃত্ত। এত ছোট মাপে যদি মন না ওঠে, তো এর সঙ্গে আরও চার মাত্রা জুড়ে দিয়ে ৪+৪+২=১০ মাত্রার লাইনও আমরা বানাতে পারি। ব্যাপারটা সেক্ষেত্রে এই রকমের দাঁড়াবে :

ওই শোনো ।প্রচণ্ড দা।পটে
লক্ষ ঢাক।ঢোল বেজে।যায়।
ভক্তের আ।সর জমে।ওঠে
ঘন-ঘন ।পতনে মূর্ছা।যায়।

আরও বাড়াতে চান? বেশ তো বাড়ান না, ফি-লাইনে আরও চারটি করে মাত্রা জুড়ে দিন। দিলে হয়তো এই রকমের একটা চেহারা মিলতে পারে :

ওই শোনো ।সাড়ম্বরে ।প্রচণ্ড দা।পটে
মহোল্লাসে ।লক্ষ লক্ষ ।ঢোল বেজে।যায়।
গর্জনে-হু।ঙ্কারে ওই ।সভা জমে ।ওঠে
ভক্তদের ।ঘন-ঘন ।পতনে মূ।র্ছা যায়।

এ হল ৪+৪+৪+২=১৪ মাত্রার অক্ষরবৃত্ত।

ঠিক এইভাবেই আমরা আরও চারটি মাত্রা বাড়াতে পারি, এবং চোদ্দর জায়গায় আঠারো মাত্রার (৪+৪+৪+৪+২=১৮) লাইন বানাতে পারি। কিন্তু তার আর দরকার কী?

কথা হচ্ছে, যে-ছন্দের চাল মূলত চার মাত্রার, তার ফি-লাইনে ওই বাড়তি দু মাত্রা যোগ করতে হয় কেন? বলি।

কবিতা পড়তে-পড়তে মাঝে-মাঝে একটু দম ফেলবার অবকাশ

চাই। একটানা তো ছোটা যায় না; ছুটতে-ছুটতে খানিক-খানিক দাঁড়িয়ে নেওয়া চাই। ওই দু মাত্রা সেই ক্ষণিক-বিরতির ব্যবস্থা করেছে। ওদের যদি না জুড়ে দেওয়া হত, লাইনের শেষে তা হলে দাঁড়াবার জায়গা পাওয়া যেত না। প্রথম লাইন শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গেই সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় লাইনের উপরে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়তে হত; দ্বিতীয় লাইন ফুরিয়ে যাবার সঙ্গে-সঙ্গেই তৃতীয় লাইনের উপরে। এবং এই রকমই চলত, গোটা কবিতাটা যতক্ষণ না একেবারে ফুরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেমনভাবে তো আমরা কবিতা পড়তে পারিনে। পড়িমরি ছুট লাগিয়ে কবিতা পড়া যায় না; আর-কিছু না হোক, দম ফেলবার ফুরসতটুকু চাই। সেই ফুরসতটুকুই মিলিয়ে দিচ্ছে ফি-লাইনের শেষে জুড়ে-দেওয়া ওই মাত্রা দুটি। ওরা যদি না-থাকত, কবিতা পড়া তা হলে যে কী ঘোড়দৌড়ের ব্যাপার হত, নীচের কয়েকটি লাইন পড়লেই তা বুঝতে পারবেন :

বাজে লক্ষ ঢাকঢোল
চতুর্দিকে হট্টগোল।
আর সহ্য হয় কত,
প্রাণ হল ওষ্ঠাগত।
ভক্তেরা বিষম খান,
দলে-দলে মূর্ছা যান।

বুঝতেই পারছেন, কী হুলুস্থুলু ব্যাপার! বাড়তি দু মাত্রাকে ছেঁটে দিয়ে শুধুই চারের চালের উপরে নির্ভর করে এই ছত্র কটি দাঁড়িয়ে আছে। তার ফল হয়েছে এই যে, দাঁড়ি-কমা থাকা সত্ত্বেও লাইনের শেষে দাঁড়ানো যাচ্ছে না; ছন্দের তাড়না এতই প্রবল হয়ে উঠেছে যে, পাঠককে সে লাইন থেকে লাইনে ছুটিয়ে মারছে। এই ঘোড়দৌড়কে ঠেকাবার জন্যেই লাইনে-লাইনে বাড়তি দুটি মাত্রা জুড়ে দেওয়া দরকার।

কবিতার আলোচনায় ঘোড়দৌড় কথাটা যদি আপত্তিকর মনে হয়, তবে না হয় পাখির উপমা দেব। বাড়তি দু মাত্রা যখন থাকে না, পাখিকে তখন ক্রমাগত উড়তে হয়। আর লাইনের শেষে ওই দু মাত্রা

আশ্রয় থাকলে সেইটেকে ধরে সে একটুক্ষণের জন্যে জিরিয়ে নিতে পারে। কিংবা বলি, চারের চালের কবিতা যেন একটা বহতা নদী। ফি-লাইনের শেষের ওই দু মাত্রা তাতে বয়ার মতন ভাসছে। সাঁতার কাটতে কাটতে আমরা ওই বয়াকে গিয়ে ধরছি— ব্যাপারটা অনেকটা এই রকমের।

মজা এই যে, লাইনটাকে যখন একসঙ্গে দেখি, তখন গোটা লাইনের বিন্যাসের মধ্যে ওই বাড়তি মাত্রা দুটি এমন চমৎকারভাবে নিজেদের ঢেকে রাখে যে, ওরা যে আলাদা, তা ঠিক ধরাও পড়ে না। বিশেষ করে, ছয় কি দশের বৃত্ত ছাড়িয়ে আমরা যখন চোদ্দ মাত্রায় গিয়ে পৌছই, অতিরিক্ত ওই দু মাত্রাকে তখন ছন্দের মূল চালেরই অঙ্গ বলে মনে হয়। তার হেতুটা আর কিছুই নয়, লাইনের টুকরো-টুকরো অংশের যেমন ছোট মাপের চাল থাকে, তেমনি গোটা লাইনটারও আবার একটা বড় মাপের চাল থাকে। ছোট মাপের চালের দিকে যখন তাকাই, বাড়তি দু মাত্রাকে তখন আলাদা করে দেখতে পাই; কিন্তু বড় মাপের চালের দিকে তাকালে আর দেখতে পাইনে। তার কারণ এই যে, ছোট চালটা বাড়তি দু মাত্রাকে দূরে ঠেলে দেয়; বড় চাল তাকে নিজের মধ্যে টেনে আনে। হাতেকলমে বুঝিয়ে দিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

ওই শোনো সাডম্বরে প্রচণ্ড দাপটে
মহোল্লাসে লক্ষ লক্ষ ঢোল বেজে যায়।

এই যে দুটি লাইন, ছোট চালের হিসেব মেনে যদি এদের ভাগ করে ফেলি, ব্যাপারটা তা হলে এই রকম দাঁড়াবে:

ওই শোনো/সাড়ম্বরে/প্রচণ্ড দা/পটে
মহোল্লাসে/লক্ষ লক্ষ/ঢোল বেজে/যায়।

এইভাবে ভাগ করে দেখতে পাচ্ছি, ফি-লাইনের এক-এক অংশে (এই অংশেরই অন্য নাম 'পর্ব') চারিটি করে মাত্রা পড়ছে, আর লাইনের প্রান্তে পড়ে থাকছে সেই বাড়তি দু মাত্রা।

কিন্তু কবিতা পড়বার সময়ে তো ঠিক এই রকমের ছোট চালে পা ফেলে আমরা পড়িনে। আর-একটু লম্বা চালে এই রকমে পড়ি:

ওই শোনো সাড়ম্বরে/প্রচণ্ড দাপটে
মহোল্লাসে লক্ষ লক্ষ/ঢোল বেজে যায়।

তখন মনে হয়, লাইনগুলি যেন দুটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে আট মাত্রা, দ্বিতীয় ভাগে ছ মাত্রা।

অক্ষরবৃত্তের আঠারো মাত্রার লাইনকেও এই বড় চালে ভাঙা যায়। ভাঙলে তার প্রথম ভাগে পড়বে আট মাত্রা, দ্বিতীয় ভাগে দশ মাত্রা।

মোট কথা, বড় চালে যখন চলি, লাইনের শেষের বাড়তি দু মাত্রাকে তখন আর আলাদা করে ধরতে পারিনে। বাইরের লোক হয়েও সে তখন ছন্দের ভিতরে এসে ঢুকে পড়ে; বৈঠকখানায় দাঁড়িয়ে না থেকে অন্দরমহলে এসে আপনার লোক হয়ে যায়।

অক্ষরবৃত্তের চেহারা দেখলুম, চরিত্রের খোঁজখবর নিলুম, চালচলনেরও একটা আন্দাজ পাওয়া গেল। কিন্তু মোদ্দা কথাটা বোঝা গেল কি?

আলোচনার সুবিধের জন্যে আবার চলুন ধ্বনিকে ছেড়ে অক্ষরের কাছে ফিরে যাই। আমি বলেছি, এ-ছন্দের এক-এক লাইনে অক্ষর যত, মাত্রাও তত। এইটেই সাধারণ নিয়ম। এর যে ব্যতিক্রম হয় না, তা নয়। বিস্তর হয়। তার কারণ, ধ্বনি সর্বদা অক্ষরের আঁচল ধরে চলে না। কিন্তু ব্যতিক্রমের কথা এখুনি বলতে চাইনে। পরে বলব। অক্ষরের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও অনেক সময় ধ্বনির পরিসর কেন বাড়ে না, এবং মাত্রার যোগফলও তার দরুন একটা নির্দিষ্ট হিসেবের মধ্যেই থেকে গিয়ে কীভাবে লাইনের ভারসাম্যকে ধরে রাখে, তাও বলব। আপাতত শুধু সাধারণ নিয়ম নিয়েই আলোচনা করা যাক।

সাধারণ নিয়মটা এই যে, অক্ষর আর মাত্রার সংখ্যা এতে সমান-সমান। তার চাইতেও জরুরি কথা, অক্ষর আর যুক্তাক্ষর এ-ছন্দে তুল্য-মূল্য; অক্ষরবৃত্তের লাইনে যদি যুক্তাক্ষর-সংবলিত শব্দ ঠেসেও বসান, মাত্রা-সংখ্যার তবু ইতরবিশেষ হবে না। লাইনের ওজন তাতে বাড়বে বটে, কিন্তু দৈর্ঘ্য তার ফলে মাত্রার সীমা ছাড়াবে না। অর্থাৎ ছন্দও বে-লাইন হবে না।

দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। প্রথমে আসুন দশ মাত্রার অক্ষরবৃত্ত নিয়ে পরীক্ষা করে দেখি।

নিশীথিনী/ভোর হয়ে/আসে
আলো ফোটে/পুবের আ/কাশে।

দশ-মাত্রার অক্ষরবৃত্তে লেখা এই যে দুটি লাইন, এর মধ্যে যুক্তাক্ষর একটিও দেওয়া হয়নি। দিয়ে দেখা যাক কী হয়।

অমারাত্রি ভোর হয়ে আসে
আলো ফোটে পূর্বের আকাশে।

কী হল? কিছুই হল না। এক-এক লাইনে একটি করে যুক্তাক্ষর ঢোকালুম, কিন্তু অক্ষরবৃত্ত তাকে দিব্যি গিলে নিল। দশ-মাত্রা দশ-মাত্রাই আছে, এগারো হয়ে গিয়ে ছন্দ-পতন ঘটায়নি।

আরও কিছু ভার তা হলে চাপানো যাক :

অন্ধকার সান্ধ্য হয়ে আসে
রক্ত-আভা পূর্বের আকাশে।

এক-এক লাইনে এবারে দু-দুটো করে যুক্তাক্ষর বসালুম। কিন্তু তাতেই বা কী হল? মাত্রা সেই দশেই আটকে আছে।

ভার তা হলে আরও বাড়িয়ে দেখি :

কৃষ্ণরাত্রি সান্ধ্য হয়ে আসে
রক্তচ্ছটা পূর্বের আকাশে।

কিন্তু তাতেও কিছু ইতর-বিশেষ হল না। ফি-লাইনে তিন-তিনটে যুক্তাক্ষরকে অক্লেশে গিলে নিয়ে দশ-মাত্রার অক্ষরবৃত্ত সেই দশ-মাত্রাতেই দিব্যি দাঁড়িয়ে আছে।

দশ-মাত্রায় যদি মন না ওঠে, তো চোদ্দ-মাত্রার লাইন নিয়ে পরীক্ষা করুন।

'চলো ভাই মাঠে যাই বেড়াইয়া আসি'

বাল্যে-পাঠ্য একটি বিখ্যাত কবিতার এটি প্রথম লাইন। এর ছন্দ অক্ষরবৃত্ত। অক্ষরের সংখ্যা এখানে চোদ্দ, মাত্রার সংখ্যাও তা-ই। যুক্তাক্ষর এতে একটিও নেই। কিন্তু থাকলেও তার ফলে মাত্রার সংখ্যা বেড়ে যেত না। প্রমাণ দিচ্ছি :

চলো বন্ধু মাঠে যাই বেড়াইয়া আসি

ভাইকে তাড়িয়ে দিয়ে আমরা বন্ধুকে এনে ঘরে ঢোকালুম। ফলে একটি যুক্তাক্ষরও এল। কিন্তু মাত্রার সংখ্যা তবু চোদ্দ-ই। এবারে দেখুন :

চলো বন্ধু মুক্ত-মাঠে বেড়াইয়া আসি

দু-দুটি যুক্তাক্ষর ঢুকেছে। কিন্তু মাত্রার সংখ্যা তবু বাড়েনি। অতঃপর :

চলো বন্ধু সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে মাঠে যাই

অর্থাৎ তিন-তিনটে যুক্তাক্ষর ঢুকল। কিন্তু মাত্রার সংখ্যা তবু সেই চোদ্দই, তার বেশি নয়। কিংবা :

সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে নিয়ে মুক্ত-মাঠে চলো

এবারে চার-চারটে যুক্তাক্ষর। কিন্তু লাইনের মাত্রা-সংখ্যা তবু সেই চোদ্দতেই ঠেকে আছে, এক ক্রান্তিও বাড়েনি।

যুক্তাক্ষরের সংখ্যা এইভাবে আরও বাড়ানো যায়। কত যে বাড়ানো যায়, সেটা বোঝাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

'দুর্দান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত'

যুক্তাক্ষর এখানে গিসগিস করছে। কিন্তু মাত্রার সংখ্যা তবু সেই চোদ্দ তো চোদ্দই, ওজনে-ভারী এতগুলি যুক্তাক্ষরকে বক্ষে ধারণ করেও অক্ষরবৃত্তের এই লাইনটি তবু সেই চোদ্দ-মাত্রাতেই ঠেকে আছে।

অক্ষরবৃত্ত যেন সর্বংসহা বসুন্ধরার মত। তার উপরে যতই না কেন ভার চাপানো হোক, মুখ বুজে সে সহ্য করবে। তার জন্যে সে বাড়তি-মাত্রার মাশুল চাইবে না ; যেমন অন্যান্য অক্ষরকে, তেমনি যুক্তাক্ষরকেও সে মাত্র এক-মাত্রার মূল্যেই বহন করে। তার দৃষ্টান্তও আমরা দিয়েছি।

কথা এই যে, দুটি অক্ষর যদি দৃশ্যত পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত না-হয়েও শ্রবণের বিচারে পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে যায়, তো অক্ষরবৃত্ত ছন্দের কবিতায় সেই অক্ষর দুটিকে—দৃশ্যত তারা যুক্ত না-হওয়া সত্ত্বেও—মাত্র এক-মাত্রার মাশুল দিয়েই তরিয়ে দেওয়া যায় কি ? যায় না, এমন কথা কেমন করে বলব ? কবিরা অনেক ক্ষেত্রে দিব্যি তরিয়ে দেন। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :

কর্পূর-সুবাসে জল ভরপুর হয়েছে

এই যে লাইনটি, এর মধ্যে 'কর্পূর' শব্দটি যে তিন-মাত্রা, তাতে সন্দেহ নেই। প্রশ্ন হচ্ছে, 'ভরপুর'ও কি তা-ই ?

হ্যাঁ, তাই। তার কারণ, 'ভরপুর'-এর 'র্‌পু' দৃশ্যত যুক্ত নয় বটে, কিন্তু শ্রবণের বিচারে যুক্ত। কান তাকে 'ভর্পুর' হিসেবেই গ্রহণ করেছে। এবং ছন্দ-বিচারে চোখের চাইতে কানই যে বড় হাকিম, তা কে না জানে !

অক্ষরের চাইতে ধ্বনি বড়। অক্ষর তো আর কিছুই নয়, ধ্বনিরই একটা দৃশ্যরূপ মাত্র। আসলে যা ধর্তব্য, তা হচ্ছে ধ্বনি। তাই, চোখের নয়, কানের রায়ই শিরোধার্য। আর তাই, অক্ষরবৃত্তের লাইনে চার-অক্ষরের শব্দ 'কলকাতা'কে অক্লেশে তিন-মাত্রা হিসেবে চালানো যায় (কেননা কান তাকে 'কল্কাতা' বলে জানে), পাঁচ-অক্ষরের শব্দ 'খিদিরপুর'কে চালানো যায় চার-মাত্রা হিসেবে (কেননা কানের কাছে সে 'খিদ্দির্পুর'), ছ-অক্ষরের শব্দ 'কারমাইকেল'কে তরিয়ে দেওয়া যায় পাঁচ-মাত্রার মাশুল দিয়ে (কেননা কর্ণে তিনি 'কার্মাইকেল')। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের এই একটা মস্ত সুবিধে। যেখানে সম্ভব, শব্দকে সেখানে অক্ষরের তুলনায় কম-মাত্রার মাশুল দিয়ে তরানো যায়, ছন্দের ভারসাম্য তাতে নষ্ট হয় না। আবার তার দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :

চারজন হাড়গিলে-ছোকরা ঘুরবার বাতিকে
কাতরাতে কাতরাতে চলল হাতরাসের দিকে।

লক্ষ করে দেখুন, এই লাইন দুটির প্রত্যেকটিতেই অক্ষরের সংখ্যা আঠারো। কিন্তু তা সত্ত্বেও এরা চোদ্দ-মাত্রার লাইন হিসেবে চলতে পারে। তার কারণ, চক্ষু এদের যে-চেহারাই দেখুক, কানের কাছে সংকুচিত হয়ে গিয়ে এরা এই রকমের চেহারা নেয় :

চার্জন হার্গিলে-ছোক্রা ঘুর্বার বাতিকে
কাত্রাতে কাত্রাতে চল্ল হাত্রাসের দিকে।

আবার বলি, ছন্দের ব্যাপারে অক্ষর-বস্তুটা কিছুই নয়, সে ধ্বনির প্রতীক মাত্র, এবং ধ্বনিটাই হচ্ছে একমাত্র ধর্তব্য বিষয়। পরে তার আরও অজস্র প্রমাণ মিলবে।

বুদ্ধিমান পড়ুয়া আশা করি ইতিমধ্যেই একটা জরুরি কথা বুঝে নিয়েছেন। সেটা এই যে, অক্ষরবৃত্ত ছন্দ সংকোচনকে প্রশ্রয় দেয়, আর তাই হসন্ত অক্ষরমাত্রেই সেখানে পরবর্তী অক্ষরের সঙ্গে জুড়ে গিয়ে তার আত্মস্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। বিশেষত, যুক্ত হবার বিধি যেখানে আছেই, সেখানে—দৃশ্যত আলাদা থাকলেও—শ্রবণের বিচারে যুক্ত হতে তাদের কিছুমাত্র আটকায় না। 'ল'য়ে 'ক'য়ে মিলন প্রথাসম্মত বলেই 'কলকাতা' আমাদের শ্রবণে 'কল্কাতা' হয়, 'ত'য়ে 'ত'য়ে মিলন রীতিসিদ্ধ বলেই 'পাততাড়ি' গুটিয়ে গিয়ে হয় 'পাত্তাড়ি'।

কিন্তু মিলন যেখানে রীতিসিদ্ধ নয়, শ্রবণ কি সেখানেও অসবর্ণ বিবাহে অনুমোদন দেয়? তাও দেয়। এবং আমি যতদূর জানি, রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম, শ্রবণের অনুমোদন নিয়ে, সেই অসবর্ণ মিলন ঘটাতে সাহসী হয়েছিলেন। 'আকবর বাদশার সঙ্গে হরিপদ কেরানির কোনো ভেদ নেই'—'বাঁশি' কবিতার এই লাইনটির সঙ্গে সকলেই পরিচিত। ছন্দ অক্ষরবৃত্ত। তার প্রশ্রয়ে 'আকবর' হয়েছে তিন-মাত্রা; 'বাদশা'র শব্দটিও তা-ই। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, 'ক'য়ে 'ব'য়ে মিলন রীতিবিরুদ্ধ নয় বটে, কিন্তু সেই 'ব-'ফলায় ইংরেজি 'বি'-অক্ষরের ধ্বনি আসে না (দৃষ্টান্ত: পক্ক, নিক্বণ), এক্ষেত্রে কিন্তু সেই ধ্বনিকে সম্পূর্ণ বাঁচিয়েই কবি তাকে 'ক'-য়ের সঙ্গে জুড়েছেন। 'বাদশা'র ব্যাপারটাও সমান চমকপ্রদ। 'দ'-য়ে 'শ'-য়ে যুক্ত হবার রীতি নেই, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তবু অসম সাহসে তাদের মিলিয়ে দিয়েছেন।*

একালের কবিতায় অবশ্য এমন অসবর্ণ মিলন আকছার ঘটতে দেখি। কিন্তু ভুলে না যাই যে, রবীন্দ্রনাথই এই দুঃসাহসিক মিলনের প্রথম পুরোহিত।

অক্ষরবৃত্ত সম্পর্কে আমাদের ক্লাসে এ-যাবৎ যে-সব কথাবার্তা হল, তার থেকে ছেঁকে নিয়ে মোদ্দা কথাটা তা হলে এই দাঁড়াচ্ছে:

(১) ৪ কিংবা তার গুণিতকের সঙ্গে ২ যোগ করলে যে সংখ্যাটা

* 'পরিশিষ্ট' অংশে জিজ্ঞাসু পড়ুয়ার চিঠি দেখুন।

পাওয়া যায়, সেই সংখ্যার মাত্রা দিয়েই তৈরি করা যায় অক্ষরবৃত্ত কবিতার লাইন।

(২) এ-ছন্দ শব্দের সংকোচনকে প্রশ্রয় দেয়; তাই শব্দের ভিতরকার হসন্ত অক্ষর এ-ছন্দে পরবর্তী অক্ষরের সঙ্গে যুক্ত হতে চায়। দৃশ্যত যেখানে তারা যুক্ত হয় না, সেখানেও তারা শ্রবণে যুক্ত হয়; ফলে দৃশ্যত তারা পৃথক থাকে বটে, কিন্তু শ্রবণে তারা মিলিত হয়ে দুয়ে মিলে একটি মাত্র মাত্রার মর্যাদা পায়।

(৩) দুটি অক্ষরের মিলন যেখানে রীতিসিদ্ধ, সেখানে তো তারা শ্রবণের অনুমোদন নিয়ে মিলিত হয়ই (খিদিরপুর=খিদির্পুর=৪ মাত্রা),—মিলন যেখানে রীতিসিদ্ধ নয়, সেখানেও অনেক সময় শ্রবণের ঔদার্যে তাদের অসবর্ণ বিবাহ ঘটে, এবং অক্ষরবৃত্ত ছন্দ তাতেও বেজার হয় না (বাদশা=২ মাত্রা)।

অক্ষরবৃত্তে এই অসবর্ণ মিলনের সুন্দর একটি দৃষ্টান্ত আমরা রবীন্দ্রনাথের 'বাঁশি' কবিতা থেকে তুলে দিয়েছি। এবারে দেখা যাক, আমরা নিজেরাও এইভাবে অক্ষরে-অক্ষরে অসবর্ণ বিবাহ ঘটাতে পারি কি না।

> বাজনা বাজে পূজার প্রাঙ্গণে,
> ফোটেনি সজনের কুঁড়িগুলি।
> খাজনার আতঙ্ক জাগে মনে,
> শস্য খেয়ে গিয়েছে বুলবুলি।

এও অক্ষরবৃত্ত ছন্দেরই কবিতা। এর ফি-লাইনে অক্ষরের সংখ্যা এগারো বটে, কিন্তু মাত্রার সংখ্যা দশ। তার কারণ আর কিছুই নয়, ফি-লাইনে এমন এক-একটা শব্দ আছে, ভিতরে হসন্ত অক্ষর থাকায় শ্রবণে যা সংকুচিত হয়ে যায়। প্রথম লাইনে সেই শব্দটি হচ্ছে 'বাজনা' (শ্রবণে গুটিয়ে গিয়ে সে দু-মাত্রার মর্যাদা পায়), দ্বিতীয় লাইনে সেই শব্দটি হচ্ছে 'সজনের' (শ্রবণে গুটিয়ে গিয়ে সে তিন-মাত্রায় দাঁড়াচ্ছে), তৃতীয় লাইনে সেই শব্দটি হচ্ছে 'খাজনার' (শ্রবণে সেও গুটিয়ে গিয়ে হচ্ছে তিন-মাত্রার শব্দ), আর চতুর্থ লাইনের সেই শব্দটি হচ্ছে 'বুলবুলি' (কানের কাছে যার সংকুচিত শরীরের মূল্য মাত্র তিন-মাত্রা)। প্রতিটি

ক্ষেত্রেই পরবর্তী অক্ষরের সঙ্গে শব্দের মধ্যবর্তী হসন্ত অক্ষরের মিলন এখানে অসবর্ণ। (প্রথম তিনটি ক্ষেত্রে 'জ'য়ে 'ন'য়ে মিলন ঘটেছে, যা রীতবিরুদ্ধ। চতুর্থ ক্ষেত্রে মিলন ঘটেছে 'ল'য়ে আর ইংরেজি 'বি' অক্ষরের ধ্বনিসম্পন্ন 'ব'য়ে ; তাও রীতিসিদ্ধ নয়। চোখের বিচারে তারা অবশ্য আলাদাই রইল, শুধু কানের বিচারেই তারা মিলিত।)

এখন একটা মজার কথা বলি। অক্ষরের এই মিলন-লীলা যে নেহাতই ঘরোয়া, অর্থাৎ একই শব্দের গণ্ডির মধ্যে যে এই মিলন চলে, তা কিন্তু নয়। এতক্ষণ অবশ্য শুধু ঘরোয়া মিলনেরই দৃষ্টান্ত দিয়েছি। এইবার বলি, এক বাড়ির মেয়ে যেমন অন্য বাড়ির ছেলের প্রেমে পড়ে, তেমনি এক-শব্দের অক্ষর অনেক সময় আর-এক শব্দের অক্ষরের সঙ্গে হাত মেলাতে চায়। সে-সব ক্ষেত্রে দেখা যায়, শব্দের প্রান্তবর্তী হসন্ত অক্ষরটি পরবর্তী শব্দের আদ্যক্ষরের সঙ্গে মিলিত হতে চাইছে। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :

কালকা মেলে টিকিট কেটে সে
কাল গিয়েছে পাহাড়ের দেশে

এর মধ্যে, অক্ষর-সংখ্যা যা-ই হোক, 'কালকা মেলে' শব্দ দুটির মোট মাত্রা-সংখ্যা ৪ ; 'কাল গিয়েছে'র মাত্রা-সংখ্যাও তাই। কানের কাছে এদের প্রথমটির চেহারা 'কাল্কা মেলে' ; দ্বিতীয়টির চেহারা 'কাল্গিয়েছে'। অক্ষরে-অক্ষরে মিলন ঘটেছে দুটি ক্ষেত্রেই। কিন্তু প্রথম ক্ষেত্রে সে-মিলন ঘরোয়া ('কালকা' শব্দটার মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ) আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মিলন ঘটেছে এক শব্দের ('কাল') শেষ অক্ষরের (যা কিনা হসন্ত) সঙ্গে তার পরবর্তী শব্দের ('গিয়েছে') প্রথম অক্ষরের।

এইখানে একটা কথা বলে রাখি। অক্ষরে অক্ষরে মিলন ঘটিয়ে, যুক্তাক্ষরের মায়া সৃষ্টি করে, মাত্রা কমাতে মজা লাগে, বলাই বাহুল্য। কিন্তু মজা লাগে বলেই যে প্রতি পদে এইভাবে মিলন ঘটাতে হবে, তা কিন্তু ঠিক নয়। এ-সব সেয়ানা কৌশল বার বার খাটালে এর চমকটাই আর থাকে না, পাঠকও বিরক্ত বোধ করেন। আর তা ছাড়া, কবিতার মধ্যে এই ধরনের মিলনের বাড়াবাড়ি ঘটলে ছন্দ-অনুসরণেও তাঁর অসুবিধে ঘটে। লক্ষ রাখতে হবে, কবিতার ছন্দের মধ্যে পাঠক যেন

বেশ স্বচ্ছন্দে ঢুকতে পারেন ; তারপর ভিতরে ঢুকে যখন কিনা বেশ অনায়াসে তিনি চলাফেরা করে বেড়াচ্ছেন, তখন বরং এই ধরনের এক-আধটা চমক লাগিয়ে দেওয়া যেতে পারে, সেটা তাঁর ভালই লাগবে।

আর-একটা কথা এই যে, লাইনের যে-কোনও জায়গায় কিন্তু এইভাবে অক্ষরে-অক্ষরে মিলন ঘটানো সম্ভবও নয়। অক্ষরবৃত্তের যে একটা চার-মাত্রার ছোট চাল আছে, সেই চালের পর্বের মধ্যেই মিলনটাকে ঘটিয়ে দেওয়া ভাল। মিলন ঘটাতে গিয়ে যদি পর্বের বেড়া ডিঙিয়ে যাই, তাতে বিপদ ঘটতে পারে। ঘটেও।

এবারে একটা জরুরি কথা বলি। কবিতা লিখতে গিয়ে লক্ষ রাখতে হবে, শব্দের উচ্চারণ আর ছন্দের চাল, এ দুয়ের মধ্যে যেন ঠিকঠাক সমন্বয় ঘটে। অর্থাৎ ছন্দের চাল ঠিক রেখে কবিতা পড়তে গিয়ে যেন দেখতে না পাই যে, ছন্দের খাতিরে শব্দের শরীরকে এমন-এমন জায়গায় ভাঙতে হচ্ছে, যেখানে তাদের ভাঙা যায় না। আবার শব্দের সঠিক উচ্চারণের খাতিরে ছন্দের চালও যেন বেঠিক জায়গায় না ভাঙে। বেঠিক জায়গায় চাল ভাঙলে ছন্দের নাভিশ্বাস উঠবে। এই বিভ্রাট যদি এড়াতে হয়, তা হলে ছন্দের চাল আর শব্দের উচ্চারণ, এই দুইয়ের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার একটা সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তোলা চাই। উপমা দিয়ে বলি, ছন্দের চাল আর শব্দ যেন একই-গাড়িতে-জুতে-দেওয়া দুই ঘোড়ার মতন। লক্ষ রাখতে হবে, সেই ঘোড়া দুটি যেন পরস্পরের বিপরীত দিকে ছুটতে না চায়। গাড়ি তা হলে এক-পাও এগোবে না। গাড়ি যাতে ঠিকমত এগোয়, তারই জন্যে চাই ঘোড়া দুটির মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ক।

সেই সম্পর্ক গড়ে তুলতে না-পারলে, অঙ্কের নিয়মে সবকিছু ঠিকঠাক থাকা সত্ত্বেও, বিপদ কীভাবে অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়, একটু বুঝিয়ে বললেই সেটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

ধরা যাক, আমরা চোদ্দ-মাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দে দু-লাইন কবিতা লিখতে চাই। তার বিষয়টা এই যে, উঁচুনিচু রুক্ষ পথে হেঁটে-হেঁটে যাত্রীদের জীবন কেটে গেল। তা কথাটাকে যদি এইভাবে বলি :

অসমতল অমসৃণ পন্থায় হেঁটে
যাত্রীদের গিয়েছে সারা জীবন কেটে

তা হলে কি ঠিক হবে?

না, হবে না। অঙ্কের হিসেবে অবশ্য সবকিছু এখানে ঠিকঠাক আছে; ফি লাইনে চোদ্দ মাত্রার বরাদ্দ চাপাতে কোনও ত্রুটি ঘটেনি; তবু কান বলছে, ঠিক হল না। তার কারণ ঘোড়া দুটো এখানে দু দিকে ছুট লাগিয়েছে; ছন্দের চাল আর শব্দের উচ্চারণে বিরোধ ঘটছে পদে-পদে। ছন্দের চাল ঠিক রেখে এই লাইন দুটিকে যদি পড়তে যাই, তো এইভাবে পড়তে হয়:

অসমত/ল অমসৃ/ণ পন্থায়/হেঁটে
যাত্রীদের/গিয়েছে সা/রা জীবন/কেটে

অর্থাৎ শব্দগুলিকে বেজায়গায় ভাঙতে হয়। কিন্তু শব্দকে তো আমরা তেমনভাবে ভাঙতে পারিনে। বলা বাহুল্য, ছন্দের খাতিরে শব্দকে অনেক সময় ভেঙে পড়তে হয়, কিন্তু সেই ভাঙারও একটা নিয়ম আছে, খেয়ালখুশিমত যে-কোনও জায়গায় তাকে ভাঙা চলে না। শব্দ যদি ভাঙতেই হয়, তো নিয়ম মেনে এমনভাবে ভাঙতে হবে, যাতে কানের সমর্থন পাওয়া যায়। সুতরাং, হয় শব্দকে আদৌ না-ভেঙে লাইন দুটিকে আমরা এইভাবে লিখব:

অমসৃণ/অতিরুক্ষ/পথে পথে/হেঁটে
যাত্রীদের/জীবনের/দিন গেল/কেটে

আর নয়ত ভাঙতে হলেও, কানের সমর্থন নিয়ে, এই রকম ভাবে শব্দ ভাঙব:

বন্ধুর দা/রুণ রুক্ষ/পথে/পথে হেঁটে
যাত্রী-জীব/নের দিন/রাত্রি গেল/কেটে

এই রকমে যদি শব্দ ভাঙি, তা হলে অক্ষরবৃত্তের ছোট চালে (অর্থাৎ চার-মাত্রার চালে) যদি-বা ভাঙাটা চোখে পড়ে, বড় চালে (অর্থাৎ ৮+৬ মাত্রার চালে) সেটা আদৌ ধরা পড়ে না। ব্যাপারটা তখন এইরকমের দাঁড়ায়:

বন্ধুর দারুণ রুক্ষ/পথে পথে হেঁটে
যাত্রী-জীবনের দিন/রাত্রি গেল কেটে

তা হলেই দেখা যাচ্ছে যে, ছন্দ-বিভ্রাট এড়াতে হলে লাইনে-লাইনে মাত্রার সংখ্যা ঠিক রাখাটাই যথেষ্ট নয়, শব্দগুলিকে সাজিয়ে বসাবার ব্যাপারেও নিয়ম রক্ষা করা চাই। নিয়মের সার-কথাটা কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তই বলে গিয়েছেন। তাঁর পরামর্শ : "বিজোড়ে বিজোড় গাঁথ, জোড়ে গাঁথ জোড়।" অর্থাৎ কিনা বিজোড়-শব্দের পিঠে বিজোড়-শব্দ বসাতে হবে, জোড়-শব্দের পিঠে জোড়। শব্দের ব্যাপারে জোড়-বিজোড় কাকে বলে, সেটা বুঝতে কারও অসুবিধে হবার কথা নয়। যে-শব্দের অক্ষরসংখ্যা বিজোড়, সেটা বিজোড়-শব্দ। যে-শব্দের অক্ষরসংখ্যা জোড়, সেটা জোড়-শব্দ। মোদ্দা কথাটা তা হলে এই দাঁড়াচ্ছে যে, দুই কিংবা চার অক্ষরের শব্দের পিঠে জোড়-শব্দ বসাতে হবে; এক কিংবা তিন অক্ষরের শব্দের পিঠে বিজোড়-শব্দ। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের চাল ঠিক রাখবার ব্যাপারে এইটেই হচ্ছে সবচাইতে নিরাপদ নিয়ম।

... ...

এখন আমাদের আলোচনাকে একটু পিছিয়ে নিতে চাই। তার কারণ, অক্ষরে অক্ষরে মিল ঘটিয়ে, যুক্তাক্ষরের মায়া সৃষ্টি করে, অক্ষরবৃত্ত ছন্দে মাত্রা চুরি করা সম্পর্কে এর আগে যে-সব কথা বলেছি, একটা জরুরি কথাই তাতে বাদ পড়ে গিয়েছিল। আমার মাসতুতো ভাইয়ের সেই পদ্য-লিখিয়ে কনিষ্ঠ পুত্র সেটা মনে করিয়ে দিল। বুড়ো হয়েছি, সব কথা সর্বদা মনে থাকে না, চিন্তার শৃঙ্খলা নষ্ট হয়েছে, পরের কথাটা অনেক সময় আগেই বলে বসি, আগের কথার খেই হারিয়ে যায়, এগিয়ে গিয়েও মাঝে-মাঝে তাই পিছনে তাকাবার প্রয়োজন ঘটে। তাকিয়ে বুঝতে পারছি, জরুরি সেই কথাটা এবারে ঢুকিয়ে দেওয়া দরকার, নয়তো পরে আবার হয়তো ভুলে যাব।

কথাটা সংক্ষেপে এই :

অক্ষরবৃত্ত ছন্দে 'কলকাতা' যে সহজেই 'কল্কাতা' (অর্থাৎ ৩-মাত্রা) হয়ে যায়, তা আমরা দেখেছি। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, অক্ষরবৃত্তে

কবিতা লিখতে গিয়ে 'কলকাতা'কে আমরা ৪-মাত্রার শব্দ হিসেবে ব্যবহার করতে পারব না। আসলে, শব্দটাকে আমরা কীভাবে উচ্চারণ করব, তারই উপর নির্ভর করছে সে ক-মাত্রার মর্যাদা পাবে। গোটানো উচ্চারণে সে ৩-মাত্রার শব্দ বটে, কিন্তু ছড়ানো উচ্চারণে সহজেই সে আবার চার মাত্রা দাবি করতে পারে। নীচের লাইন দুটি লক্ষ করুন :

উচ্চারণভেদে হয় মাত্রাভেদ ভ্রাতা,
না হলে কলকাতা কেন হবে কলকাতা ?

বুঝতেই পারছেন, দ্বিতীয় লাইনে 'কলকাতা' শব্দটিকে দু-বারে দু-রকমে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমবারে সে গোটানো উচ্চারণে ৩-মাত্রা (কল্কাতা) ; দ্বিতীয়বারে সে ছড়ানো উচ্চারণে ৪-মাত্রা।

অক্ষরবৃত্ত ছন্দে, এইভাবে, উচ্চারণের তন্ম অনুযায়ী, 'খিদিরপুর'কে ৪-মাত্রাও করা যায়, ৫-মাত্রাও করা যায়। 'হুলকা'কে ২-মাত্রাও করা যায়, ৩-মাত্রাও করা যায়। 'শরবত'কে করা যায় কখনও ৩-মাত্রা কখনও ৪-মাত্রা। নীচের লাইনগুলি দেখুন :

শহরের দক্ষিণেতে 'খিদিরপুরে'তে
গিয়ে যদি খিদে পায়, কিছু হবে খেতে।
যদি থাকে 'খিদিরপুরে' খাবারের দোকান। 4+4+4+2
বন্ধ, তবে খেয়ে নিয়ো এক খিলি পান।
দ্বিপ্রহরে না তাসের তপ্ত 'হুলকা'য়
রাজপথে যদি বাছা মাথা ঘুরে যায়,
তদুপরি পেটে যদি ক্ষুধার 'হুলকা' ও
চলে, তবে পান ছাড়া অন্য কিছু খাও।
কলেরার ভয় যদি না-ই থাকে প্রাণে,
'শরবত' খেতে পারো পানের দোকানে।
যদি নাড়ি ছাড়ে, তবু মনে রেখো প্রিয়,
ঘোলের 'শরবত' অতি উত্তম পানীয়।

বলাই বাহুল্য, কবিতায় যা-ই লিখি না কেন, 'কলেরার সুঁই' যদি না-নিয়ে থাকেন, তবে আর যা-ই করুন, যত্রতত্র শরবত খাবেন না। কিন্তু সেটা কোনও কথা নয়। একটু লক্ষ করলেই বুঝতে পারবেন, 'খিদির-

পুর'কে এখানে প্রথমবারে ৫-মাত্রা ও দ্বিতীয়বারে ৪-মাত্রা, 'হলকা'কে এখানে প্রথমবারে ৩-মাত্রা ও দ্বিতীয়বারে ২-মাত্রা, এবং 'শরবত'কে এখানে প্রথমবারে ৪-মাত্রা ও দ্বিতীয়বারে ৩-মাত্রার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের শব্দ আসলে গোটানো ও ছড়ানো দ্বিবিধ উচ্চারণের শাসনই মেনে চলে, এবং উচ্চারণ অনুযায়ী এদের মাত্রাসংখ্যারও তারতম্য হয়।

তবে একটা কথা। এখানে ব্যবহার করেছি বটে, কিন্তু এই ধরনের শব্দকে একই কবিতার দুই স্থানে দু-রকম মাত্রার মর্যাদা দিয়ে ব্যবহার করাটা ঠিক নয়। কবিতার মধ্যে এ-সব শব্দকে একবার যদি গোটানো উচ্চারণের শাসনে আনি, তো অন্তত সেই কবিতায় তাদের আর ছড়ানো উচ্চারণের স্বাধীনতা না-দেওয়াই ভাল। দিলে তাতে মহাকাব্য অশুদ্ধ না হোক, পাঠককে অসুবিধেয় ফেলা হয়। ডাব্‌ল স্ট্যান্ডার্ড জিনিসটা কোনও ক্ষেত্রেই ভাল নয়। কবিতাতেও তাকে প্রশ্রয় দেওয়া অনুচিত।

সুতরাং অক্ষরবৃত্তে কবিতা লিখতে বসে আগেভাগেই স্থির করে নিন, যে-সব শব্দ দ্বিবিধ উচ্চারণকেই মান্য করে, ঠিক কীবিধ উচ্চারণে আপনি তাদের বাঁধবেন। একবার যদি তাদের কাউকে গোটানো উচ্চারণে শক্ত করে বাঁধেন, তো অন্তত সেই কবিতায় অন্যত্র তার বাঁধনে আর ঢিল দেওয়া ঠিক নয়। 'কলকাতা' আপনার কবিতায় যদি একবার গোটানো উচ্চারণে ৩-মাত্রার মূল্য পায়, তবে সেই কবিতাতেই পরে আর তাকে (কিংবা সেই রকমের অন্য-কোনও শব্দকে) ছড়ানো উচ্চারণে বেশি-মাত্রার মর্যাদা দেওয়া অনুচিত হবে। উপমা দিয়ে বলতে পারি, ব্যাপারটা হচ্ছে গান গাইবার আগে 'স্কেল' ঠিক করে নেবার মতো। গান গাইতে-গাইতে মাঝপথে যেমন স্কেল পালটানো চলে না, কবিতা লিখতে-লিখতে তেমনি মাঝপথে উচ্চারণের বাঁধুনি পালটানো চলে না। কোন্ রকমের বাঁধুনি আপনার মনঃপূত, সেটা আগেই ঠিক করে নিন; মাঝপথে রীতিবদল না-করাই ভাল।

সকলে এ-ব্যাপারে একমত নন, আমি জানি। সবাইকে আমার দলে টানতে পারব, এমন আশাও আমি করিনে। তবু আমি, শ্রীকবিকঙ্কণ পরশুরাম, যে-রীতিকে উচিত বলে মানি, অকপটে তা নিবেদন করলুম।

অক্ষরবৃত্ত সম্পর্কে আমাদের আলোচনা এখনকার মতো এইখানেই শেষ হল।

আপনারা হয়তো ভাবছেন, এত যে কথা হল, পয়ারের প্রসঙ্গ এখনও উঠল না কেন। ওঠেনি, তার কারণ, পয়ার আসলে আলাদা কোনও ছন্দ নয়, ছন্দের বাঁধুনিরই সে একটা রকমফের মাত্র। মূল তিনটি ছন্দের মোটামুটি পরিচয় আগে বিবৃত করি, তারপর পয়ারের প্রসঙ্গে ঢোকা যাবে।

মাত্রাবৃত্ত বা কলাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান ছন্দ

অক্ষরবৃত্তের পরিচয় মোটামুটি মিলেছে, এবার শুরু হবে মাত্রাবৃত্তের কথা। মাত্রাবৃত্ত নামটাও শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনের দেওয়া। রবীন্দ্রনাথ একে সংস্কৃতভাঙা ছন্দ বলতেন। শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায় সে-ক্ষেত্রে এর নাম দিয়েছেন ধ্বনিপ্রধান ছন্দ। যেমন অক্ষরবৃত্ত তেমনি মাত্রাবৃত্ত নামটিকেও প্রবোধচন্দ্র পরে বর্জন করেন; এবং এর নতুন নাম দেন কলাবৃত্ত। তাঁর আলোচনায় এখন এই নতুন নামটিই চালু। আমাদের আলোচনায় অবশ্য মাত্রাবৃত্ত নামটিই ব্যবহৃত হবে।

এবারে আসল কথায় আসি। গোড়ার দিকে যখন তিন-ছন্দের পার্থক্য একবার দেখিয়ে দিয়েছিলুম, তখন মাত্রাবৃত্তের দৃষ্টান্তও এক-আধটা দেওয়া হয়েছে। বলাই বাহুল্য, আলাদা-আলাদা ছন্দের দৃষ্টান্ত যদি পাশাপাশি তুলে ধরা যায়, তাদের চরিত্রের পার্থক্য তা হলে সহজে ধরা পড়ে; বুঝতে পারা যায়, একটার সঙ্গে আর-একটার অমিল কোন্‌খানে, চাল-চলনে ঠিক কোথায় তারা আলাদা।

দৃষ্টান্ত দিয়ে দিয়ে পার্থক্য ধরিয়ে দেবার সেই কাজটা এবারে আর-একটু বিশদভাবে করা যেতে পারে। তার কারণ অক্ষরবৃত্তকে আপনারা চিনে গিয়েছেন। এখন তারই পাশে যদি মাত্রাবৃত্তকে তুলে ধরি, তাদের পার্থক্য তা হলে চট্ করে ধরা পড়বে; বুঝতে পারা যাবে, কোন্ ছন্দ কীভাবে হাঁটছে, এবং দুজনে দুভাবে হাঁটছেই বা কেন।

ধরা যাক, সময়টা কার্তিক মাস, এবং বাতাসের দাঁত খানিকটা ধারালো হয়ে উঠেছে, এই খবরটাকে আমরা পদ্যে পরিবেষণ করতে

চাই। সে-ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি :

কার্তিক-নিশীথে আজ /পাচ্ছি বেশ/টের
দন্তের আ/ভাসটুকু/প্রথম-শী/তের।

তা এই লাইন দুটি যে কোন্ ছন্দে লেখা হয়েছে, তা বুঝবার জন্যে এখন আর আপনাদের মাস্টার-মশাইয়ের সাহায্য নেবার দরকার করে না। একবার মাত্র শুনেই এখন আপনারা বলে দিতে পারেন যে, এটা অক্ষরবৃত্ত। এ-ছন্দের চাল আপনারা চিনে গেছেন। কান যদি খোলা থাকে, তা হলে চোখ বুজেও এখন একে আপনারা শনাক্ত করতে পারেন। তাই না? এবারে আসুন, প্রথম-শীতেব এই সংবাদটাকে অন্য-ছন্দে পরিবেষণ করা যাক। লেখা যাক :

এবারে এ/সেছে কার্তিক,/ তার
উত্ত/রে/বাতাসেব
বরফে-ডো/বানো দন্তেব/ধা-
বাত্তিবে পাই/টেব।

বুঝতেই পারছেন যে, সংবাদটার মধ্যে একটু অতিরঞ্জন আছে। কেননা, কার্তিক মাসে শীত কিছুটা পড়ে ঠিকই, কিন্তু বাতাসেব দাঁত তাই বলে এমন-কিছু ধারালো হয়ে ওঠে না। অন্তত তখনই এমন মনে হয় না যে, সে-দাঁত বরফে-ডোবানো। তা সে যা-ই হোক, সংবাদ নিয়ে আমরা এখানে মাথা ঘামাচ্ছিনে, আমরা শুধু ছন্দের পার্থক্যটা দেখে নিতে চাই, এবং এখানে যে-ছন্দে এই খবরটাকে আমরা বেঁধেছি, তা যে অক্ষরবৃত্ত নয়, চালের পার্থক্য থেকেই তা আমরা বুঝতে পারছি।

এ হল মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। অক্ষরবৃত্তের সঙ্গে একে একবার মিলিয়ে নিন। মেলাতে গেলেই অমিলটা বেশ স্পষ্ট হয়ে ধবা পড়বে।

আরও-কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। পাশাপাশি এই দুই ছন্দের চেহারা দেখতে দেখতে এদের অমিলটা যখন একেবারে স্পষ্ট হয়ে যাবে, তখনই শুরু হবে মাত্রাবৃত্তের চরিত্র-বিচার। আগেই যদি চবিত্র-বিচার করতে বসি, ব্যাপারটা তা হলে অত সহজে পরিষ্কার হবে না। কার চরিত্র কী রকমের, সেটা বক্তৃতা দিয়ে বোঝানো শক্ত; দৃষ্টান্তের সাহায্য নিলে

সে-কাজ অনেক সহজে সম্পন্ন হয়। যার পিঠে কখনও কিল পড়েনি, তাকে যদি বলি "কিল বলিতে বদ্ধমুষ্টির সাহায্যে প্রদত্ত এক প্রকারের আঘাত বুঝায়"—তবে আর তার কতটুকুই-বা সে বুঝবে? তার চাইতে বরং গুম্ করে তার পিঠের উপরে একটা কিল বসিয়ে দেওয়া ভাল।

সুতরাং আসুন, মাত্রাবৃত্তের বৈশিষ্ট্য কী, হাতেকলমে সেটা বুঝে নিই। অর্থাৎ অক্ষরবৃত্তের পাশাপাশি আরও কয়েকবার তার চেহারাটা বেশ উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করি, এবং বুঝবার চেষ্টা করি, অক্ষরবৃত্তের সঙ্গে তার তফাতটা ঠিক কোথায়।

ধরা যাক, আমরা রেলগাড়ি নিয়ে দু-লাইন পদ্য বানাব। গর্জন করে ট্রেন ছুটছে, এবং সেই গর্জন শুনে মাঠের গোরু দিগন্তের দিকে দৌড় লাগাচ্ছে, এই হবে তার বিষয়বস্তু।

লাইন দুটিকে প্রথমে আমরা অক্ষরবৃত্তে লিখব। তা এইভাবে তাকে লেখা যেতে পারে:

> গর্জনে কম্পিত বিশ্ব,/ট্রেন ছুটে/যায়;
> আতঙ্কে গোরুর দল/দিগন্তে পালায়।

এবারে এই কথাগুলিকে মাত্রাবৃত্ত ছন্দে বেঁধে ফেলা যাক। এই ভাবে বাঁধা যেতে পারে:

> গর্জনে কাঁপে মাটি, ট্রেন ছুটে যায়।
> আতঙ্কে গোরুগুলি/দিগন্তে/ধায়।

কানের কাছে তফাতটা আশা করি ধরা পড়েছে। এবার আসুন, আর-একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। এবারে কী নিয়ে পদ্য লিখব? প্রেম নিয়ে? ভাল ভাল, পদ্য রচনার পক্ষে প্রেম অতি চমৎকার বিষয়বস্তু। তা ধরা যাক, প্রেমিক তার প্রেমিকাকে বলছে যে, সে (অর্থাৎ প্রেমিক) যদি তাকে (অর্থাৎ প্রেমিকাকে) পাশে পায়, তা হলে দৈত্যের সঙ্গেও সে (অর্থাৎ প্রেমিক) লড়তে রাজি। অক্ষরবৃত্ত ছন্দে এই কথাগুলিকে এইভাবে বাঁধা যায়:

> তুমি যদি/সারাক্ষণ/পার্শ্বে থাকো/নারী,
> দৈত্যকেও/তবে আমি/যুদ্ধ দিতে/পারি।

অনেকে হয়তো বলবেন যে, প্রেমিকের উক্তিটা এ-ক্ষেত্রে একেবারেই যাত্রা-প্যাটার্নের হয়ে গেল। তা হোক, এ তো আর একালের আটাশ-ইঞ্চি-বুকের-ছাতি লিক্‌পিকে প্রেমিক নয় যে, মিনমিনে গলায় কথা বলবে আর কোঁচার খুঁটে চোখের জল মুছতে-মুছতে ঘন-ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলবে। এ হচ্ছে সেকালের বীরপুরুষ-প্রেমিক। সেকালের প্রেমিকেরা বনবন করে তলোয়ার ঘোরাত এবং ঘ্যাচাং করে দৈত্যদানোর মুণ্ডু কেটে ফেলত। সুতরাং তাদের উক্তিতে যদি একটু বীরত্বের বড়াই থাকে, তবে তা নিয়ে এত আপত্তির কী আছে! আর তা ছাড়া উক্তি নিয়ে আমরা এখানে মাথা ঘামাচ্ছিনে, আমরা ছন্দের পার্থক্য বুঝতে চাই। সুতরাং পার্থক্যটাকে বুঝে নেবার জন্যে, আর কথা না-বাড়িয়ে, এই উক্তিটিকে এবারে আমরা মাত্রাবৃত্তে বাঁধব। এইভাবে বাঁধা যাক :

তোমাকে|যদি পার্শ্বে|পাই,
তা হলে আ|মি, নারী,
দৈত্যকেও|অকুতোভয়ে
যুদ্ধ দিতে পারি।

পার্থক্যটা বুঝতে পারছেন? নিশ্চয়ই পারছেন। তবু আসুন, আরও একটা দৃষ্টান্তের সাহায্য নেওয়া যাক।

এবারে আমরা কী নিয়ে লিখব? প্রেম নিয়ে তো লিখলুম, এবারে বিরহ নিয়ে লেখা যেতে পারে। অক্ষরবৃত্তে আমাদের বিরহী নায়কের উক্তিটা এই রকমের চেহারা নিচ্ছে :

যে নেই সম্মুখে, কানে কণ্ঠ তার বাজে ;
দিন চলে যায়, তবু রাত্রি যায় না যে।

আবার মাত্রাবৃত্তে এই একই কথাকে আমরা এইরকমে বাঁধতে পারি :

সম্মুখে নেই, তবু কানে কানে
কণ্ঠ তাহারি বাজে ;
দিন চলে যায়, দিবা অবসানে
নিশীথিনী যায় না যে।

আর নয়। অনেক দৃষ্টান্ত দিয়েছি। অক্ষরবৃত্তের দৃষ্টান্তগুলির সঙ্গে মাত্রাবৃত্তের দৃষ্টান্তগুলিকে এবারে উত্তমরূপে আর-একবার মিলিয়ে নিন।

তাদের পার্থক্য বুঝতে তা হলে আর এতটুকু অসুবিধে হবে না।

কথা এই যে, পার্থক্য যেমন অক্ষরবৃত্ত আর মাত্রাবৃত্তের মধ্যে আছে, তেমনি আবার মাত্রাবৃত্তের আপন এলাকাতেও আছে। অর্থাৎ এক-ধরনের মাত্রাবৃত্তের সঙ্গে অন্য-ধরনের মাত্রাবৃত্তের আছে। মাত্রাবৃত্তের ধরন মাত্র একটি নয়, অনেক। পার্থক্য তাদের নিজেদের মধ্যেও আছে বটে কিন্তু সেই ঘরোয়া পার্থক্যের প্রকৃতিও পৃথক।

সে-কথা পরে। মাত্রাবৃত্তের মধ্যেকার ঘরোয়া পার্থক্যের কথা পরে বোঝা যাবে। তার আগে অক্ষরবৃত্ত আর মাত্রাবৃত্তের মৌলিক পার্থক্যটা বুঝে নেওয়া চাই।

অক্ষরবৃত্তের মোটামুটি নিয়মটা আশা করি ইতিমধ্যে আপনারা ভুলে যাননি। 'মোটামুটি' কথাটা ব্যবহার করলুম এইজন্যে যে, নিয়মের ব্যতিক্রমও নেহাত কম নয়। কিছু-কিছু ব্যতিক্রমের হদিশও আমরা পেয়েছি। তা সে যা-ই হোক, ব্যতিক্রমের কথা ছেড়ে দিলে, মোটামুটি যে নিয়মটা পাওয়া যায় সেটা এই যে, অক্ষরবৃত্ত ছন্দে অক্ষর আর মাত্রার সংখ্যা সাধারণত সমান-সমান; অর্থাৎ এর এক-এক লাইনে যত অক্ষর তত মাত্রা। শুধু তাই নয়, যুক্তাক্ষর যদিও শব্দের ওজন বাড়ায়, তবু অক্ষরবৃত্ত-ছন্দের গণনাপদ্ধতি এতই সমদর্শী যে, যুক্তাক্ষরকে সে এক-মাত্রার বেশি মর্যাদা দেয় না।

মাত্রাবৃত্তের সঙ্গে অক্ষরবৃত্তের প্রধান পার্থক্যটা এইখানেই।

মাত্রাবৃত্তের বেলায় যে-নিয়মে আমরা এক-একটা লাইনের ধ্বনি-প্রবাহকে ভাগ করে মাত্রা-গণনা করি, তাতে প্রতিটি অক্ষর তো এক-মাত্রার মূল্য পায়-ই, যুক্তাক্ষর পায় দু-মাত্রার মূল্য। (বলা বাহুল্য, সেই যুক্তাক্ষরটি শব্দের মধ্যে কিংবা অন্তে থাকা চাই, এবং সেই যুক্তাক্ষরের ঠিক পূর্ববর্তী বর্ণটি হস্‌বর্ণ না-হওয়া চাই*; শব্দের আদিতে যুক্তাক্ষর

---

* শব্দের মধ্যে কিংবা অন্তে থাকা সত্ত্বেও যুক্তাক্ষর দু-মাত্রার মূল্য পায় না, যদি সেই যুক্তাক্ষরের পূর্ববর্তী বর্ণটি হয় হস্‌বর্ণ। দৃষ্টান্ত: ট্রান্‌স্লেশন। এক্ষেত্রে যুক্তাক্ষরটি শব্দের মধ্যবর্তী হওয়া সত্ত্বেও—যেহেতু তার পূর্ববর্তী বর্ণটি হস্‌ বর্ণ, তাই—দু-মাত্রার মূল্য পাচ্ছে না। মাত্রাবৃত্তেও না।

থাকলে তার মাত্রাগত মূল্য বাড়ে না, সে তখন ধ্বনিগত ওজনের বিচারে আর-পাঁচটা সাধারণ অক্ষরের তুল্য-মূল্য। যুক্তস্বর 'ঐ' আর 'ঔ'-য়ের দাপট অবশ্য আরও কিছু বেশি। শব্দের আদি-মধ্য-অন্ত যেখানেই থাক্, মাত্রাবৃত্তে তারা দু-মাত্রা আদায় করবেই।)

আসলে কথাটা এই যে, অক্ষরবৃত্ত ছন্দে উচ্চারণকে সংকুচিত ক'রে মাত্রার যোগফলে গোল না-ঘটিয়েও শব্দের ওজন বাড়িয়ে নেবার যে সুবিধেটা পাওয়া যায়, মাত্রাবৃত্তে সেটা মেলে না। মাত্রাবৃত্তে যদি যুক্তাক্ষর ঢোকাই, তবে দু-মাত্রার মূল্য সে ঠিকই আদায় করে ছাড়বে। (অবশ্য—আবার বলি—সে যদি শব্দের মধ্যে কিংবা অন্তে থাকে এবং তার পূর্ববর্তী বর্ণটি যদি হস্‌বর্ণ না হয়।) মাত্রার মাশুল ফাঁকি দিয়ে শব্দের ওজন বাড়াবার কোনও উপায়ই এ-ক্ষেত্রে নেই। নীচের লাইন দুটি লক্ষ করুন :

আকাশে হঠাৎ দেখে একফালি চাঁদ
ছন্দের কামড়ে কবি হলেন উন্মাদ।

বলাই বাহুল্য, এই লাইন দুটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে লেখা। এর প্রথম লাইনে অক্ষরের সংখ্যা মোট চোদ্দ, যুক্তাক্ষর একটিও নেই, এবং মাত্রার সংখ্যাও মোট চোদ্দ। দ্বিতীয় লাইনে অক্ষরের সংখ্যা মোট চোদ্দ, তার মধ্যে দু-দুটি যুক্তাক্ষর, কিন্তু মাত্রার সংখ্যা তবু চোদ্দ তো চোদ্দই, তার এক-কাচ্চাও বেশি নয়। অর্থাৎ যুক্তাক্ষরের জন্যে সেখানে বাড়তি মাত্রার মাশুল গুনতে হয়নি।

মাত্রাবৃত্ত হলে কিন্তু এমনটি হতে পারত না। সেখানে যুক্তাক্ষর ঢোকালেই সে দু-মাত্রা মাশুল আদায় করে ছাড়ত। নীচের লাইন দুটি লক্ষ করুন :

যেই তিনি/ দেখেছেন/ একফালি/ চাঁদ
কবিবর/ হয়েছেন/ ঘোর উন্/মাদ।

এ-দুটি লাইন মাত্রাবৃত্ত ছন্দে লেখা। প্রথম লাইনে অক্ষরের সংখ্যা মোট চোদ্দ, যুক্তাক্ষর একটিও নেই, এবং মাত্রার সংখ্যা মোট চোদ্দ। দ্বিতীয় লাইনে অক্ষরের সংখ্যা মোট তেরো, কিন্তু মাত্রার সংখ্যা তবু চোদ্দ,

তার কারণ তেরোটি অক্ষরের মধ্যে একটি হচ্ছে যুক্তাক্ষর, এবং সেই যুক্তাক্ষরটি দু-মাত্রা আদায় করে ছেড়েছে। হিসেবটা সুতরাং এই রকমের দাঁড়াল। বারোটি সাধারণ অক্ষর=১২ মাত্রা; তৎসহ একটি যুক্তাক্ষর=২ মাত্রা; মোট ১৪ মাত্রা। বাস্।

প্রশ্ন এই যে, যুক্তাক্ষরকে এখানে আমরা দু-মাত্রা দিচ্ছি কেন। উত্তর: দিতে বাধ্য হচ্ছি; ছন্দের চাল নইলে ঠিক থাকে না। ছন্দের চাল ঠিক রাখবার জন্যেই যুক্তাক্ষরকে এখানে আমরা বিশ্লিষ্ট করছি; তাকে ভেঙে দুটি পৃথক অক্ষর হিসেবে পড়ছি। এবং সেইজন্যেই (অর্থাৎ তাকে ভেঙে দুটি পৃথক অক্ষর হিসেবে পড়ছি বলেই) তাকে দু-দুটি মাত্রা দিতে হচ্ছে।

অক্ষরবৃত্ত আশ্লেষে স্ফূর্তি পায়; মাত্রাবৃত্ত বিশ্লেষে। অক্ষরবৃত্ত জোড়া দিতে চায়, মাত্রাবৃত্ত ভাঙতে। অক্ষরবৃত্তে শব্দের মধ্যবর্তী বিযুক্ত হস্‌বর্ণও অনেক সময়, দৃশ্যত না হোক, শ্রবণের ঔদার্যে তার পরবর্তী অক্ষরের সঙ্গে যুক্ত হয়। যথা চারজন=চার্জন। মাত্রাবৃত্তে তার উল্টো নিয়ম। সেখানে যুক্তাক্ষরকেও আমরা বিযুক্ত করে পড়ি। যথা সার্জন=সার্‌জন। অক্ষরবৃত্তে পোস্‌ট-অফিসের চতুরক্ষর 'ডাকতার'-বাবুটিকেও প্রয়োজন-বোধে কানের কাছে ত্রিবর্ণ 'ডাক্তার' হিসেবে চালিয়ে দিয়ে ১-মাত্রা গাপ করা যায়। মাত্রাবৃত্তে সে-ক্ষেত্রে খাঁটি ত্রিবর্ণ 'ডাক্তার'বাবুটিও ৪-মাত্রার কম ফি নেন না। কানের কাছে তিনিই তখন চতুরক্ষর 'ডাক্‌তার'বাবু। অক্ষরবৃত্তে 'খাঁকতি'র খাঁই, দরকার হলে ২-মাত্রার মূল্য দিয়েই মেটাতে পারি (কানের কাছে তিনি তখন 'খাঁক্তি'); মাত্রাবৃত্তে 'ভক্তি'র মতো বিশুদ্ধ হৃদয়বৃত্তিও 'ভক্‌তি' হিসেবে শক্ত হাতে পুরো তিন মাত্রা আদায় করে ছাড়ে।

মাত্রাবৃত্তের এইটিই হচ্ছে বৈশিষ্ট্য। যুক্তাক্ষরকে সে যুক্ত থাকতে দেয় না, তাকে সে ভেঙে দেয়। এইজন্যেই এককালে একে যুক্তাক্ষর-ভাঙা ছন্দ বলা হত।

বাংলা কবিতায় যুক্তাক্ষরকে এইভাবে ভেঙে পড়বার কোনও সুনির্দিষ্ট রীতি আগে ছিল না। রবীন্দ্রনাথ এই নতুন রীতির প্রবর্তক। প্রবর্তনা

ঘটল তাঁর 'মানসী'-পর্বের কবিতায়। তার আগে যে তিনি কিংবা আর-কেউ যুক্তাক্ষরকে কদাচ ভেঙে ব্যবহার করেননি, এমন বলতে পারিনে, তবে ভাঙলেও সেটা আকস্মিক ঘটনা, তখনও সেই ভাঙাটা কোনও নির্দিষ্ট নিয়মের ব্যাপার হয়ে ওঠেনি। অর্থাৎ অক্ষরবৃত্তের জানলা দিয়ে মাত্রাবৃত্ত তখন এক-আধবার এসে উঁকি দিয়ে যেত মাত্র, তার বেশি কিছু নয়। 'মানসী'তেই প্রথম দেখতে পাওয়া গেল যে, যুক্তাক্ষরকে ভেঙে ব্যবহার করবার প্রবণতা একটা নির্দিষ্ট, পরিকল্পিত নিয়মের বাঁধনে এসে ধরা দিয়েছে। সেই হিসেবে 'মানসী'তেই এই নতুন ছন্দের—মাত্রাবৃত্তের—সূচনা।

... ...

দেখতে পেলুম, মাত্রাবৃত্তের বেলায় আমরা যুক্তাক্ষরগুলিকে ভেঙে-ভেঙে পড়ি। ছন্দের চাল নইলে ঠিক থাকে না। চালটাকে ঠিক রাখবার জন্যেই এ-ক্ষেত্রে শব্দের ভিতরকার কিংবা শেষের যুক্তাক্ষরকে ভেঙে দুটি আলাদা-আলাদা অক্ষর হিসেবে গণ্য করতে হয়, এবং আলাদা-আলাদাভাবেই তাদের মাত্রার মাশুল চুকিয়ে দিতে হয়। (যুক্তস্বর ঐ কিংবা ঔ অবশ্য শব্দের আদিতে থাকলেও মাত্রাবৃত্তে দু-মাত্রার মর্যাদা পায়। সে-কথা আমরা আগেও বলেছি।) আমরা লিখি বটে 'শব্দ', কিন্তু মাত্রার মূল্য দিতে গিয়ে তাকে 'শব্‌দ'রূপে গণ্য করি। আমরা দেখি বটে 'অক্ষর', কিন্তু মাত্রার মাশুল দেবার বেলায় তাকেই 'অক্‌খর' হিসেবে দেখতে হয়। (বিদ্বজ্জন অবশ্য 'অক্‌ষর' শুনলে আরও বেশি খুশি হবেন। কিন্তু আমরা তো আর বিদ্বজ্জন নই, তাই 'অক্‌খর' শুনেই তুষ্ট থাকব।) আমরা 'ছন্দ'-বিচার করতে গিয়ে মাত্রাবৃত্তের বেলায় তাকে 'ছন্‌দ' হিসেবে বিচার না করে পারি না।

অর্থাৎ চৌদ্দ মাত্রায় লাইন সাজিয়ে আমরা যখন লিখি :

ছন্দের গুঁতো খেয়ে পোড়োদের হায়
চোখ থেকে অবিরল অশ্রু গড়ায়।
কহে কবিকঙ্কণ, কান্না থামাও,
ক্লাস থেকে মানে-মানে চম্পট দাও।

তখন যুক্তাক্ষরগুলিকে একে-একে ভেঙে-ভেঙে আমরা মাত্রার মাশুল চুকিয়ে দিই ; ফলে লাইনগুলির চেহারা বস্তুত এই রকমের দাঁড়ায় :

ছন্‌দের গুঁতো খেয়ে পোড়োদের হায়
চোখ থেকে অবিরল অশ্‌রু গড়ায়।
কহে কবিকংকণ, 'কান্‌না থামাও,
ক্লাস থেকে মানে-মানে চম্‌পট দাও।'

লক্ষ করুন, সর্বক্ষেত্রেই আমরা যুক্তাক্ষরকে ভেঙে দিয়েছি, ফলে ফি-লাইনে এখন চোদ্দটি করে অক্ষর পাচ্ছি, এবং সেই চোদ্দ অক্ষরের প্রত্যেকেই এক-একটি করে মাত্রার মূল্য পাচ্ছে। (ভাঙিনি শুধু একটি যুক্তাক্ষরকে ; চতুর্থ লাইনের 'ক্লাস' শব্দের 'ক্ল'-কে। এই ব্যতিক্রমের কারণ আপনারা আগেই জেনেছেন। যুক্তাক্ষরটি এক্ষেত্রে শব্দের প্রথমেই রয়েছে ; ফলে তাকে ভাঙা সম্ভব নয়। শব্দের প্রথমে আছে বলে মাত্রাবৃত্তেও সে এক-মাত্রার বেশি দাবি করবে না।)

আসলে ব্যাপারটা এই যে, মাত্রাবৃত্তের বেলায় হস্‌বর্ণগুলিকেও একটি করে মাত্রার মূল্য দিয়ে দিতে হয়। অক্ষরবৃত্তের ক্ষেত্রে শুধু বিযুক্ত হস্‌বর্ণগুলিকেই আমরা মাত্রার মূল্য দিই (অনেক সময় তাও দিই না, বিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও তাদের মাত্রা আমরা দরকার হলেই গাপ করি) ; মাত্রাবৃত্তের বেলায় সে-ক্ষেত্রে বিযুক্ত হস্‌বর্ণগুলি তো মাত্রার মূল্য পায়ই, তদুপরি যে-সব হস্‌বর্ণ যুক্তাক্ষরের মধ্যে লুকোনো, মাত্রাবৃত্ত তাদেরও যুক্তাক্ষরের ভিতর থেকে টেনে বার করে আনে, এবং তাদের হাতেও একটি করে মাত্রার মূল্য ধরিয়ে দেয়। অক্ষরবৃত্তের 'কষ্ট' (২ মাত্রা) তাই মাত্রাবৃত্তের কাছে 'কষ্‌ট' (৩ মাত্রা), অক্ষরবৃত্তের 'আনন্দ' (৩ মাত্রা) তাই মাত্রাবৃত্তের কাছে 'আনন্‌দ' (৪ মাত্রা) ; অক্ষরবৃত্তের 'মহোল্লাস' (৪ মাত্রা) তাই মাত্রাবৃত্তের কাছে 'মহোল্‌লাস' (৫ মাত্রা)। এবং এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, অক্ষরবৃত্তের 'রাস্তা' আর মাত্রাবৃত্তের 'রাস্‌তা' মোটেই এক নয়। আর তাই মাত্রাবৃত্তকে আসলে মাত্‌রাবৃত্‌ত লিখলেই ঠিক হত ; ছান্‌দসিকেরা তাতে বিন্দুমাত্‌র অসন্‌তুষ্‌ট হতেন না।

আমরা বলেছি, মাত্রাবৃত্তের সূচনা 'মানসী' পর্বের কবিতায়।

'মানসী'র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, "আমার রচনার এই পর্বেই যুক্ত অক্ষরকে পূর্ণ মূল্য দিয়ে ছন্দকে নূতন শক্তি দিতে পেরেছি।" পূর্ণ মূল্য দেওয়ার অর্থ দুই মাত্রার মূল্য দেওয়া। বাংলা কবিতায় যুক্তাক্ষরকে ইতিপূর্বে দুই মাত্রার মূল্য দেবার সুনির্দিষ্ট রীতি ছিল না। এখন যুক্তাক্ষরকে ভেঙে তাকে দুই মাত্রার মূল্য দিয়ে দেখা গেল, ছন্দের চালই একেবারে পালটে গেছে। ঘাড়ের উপর থেকে বাড়তি বোঝা নামিয়ে দেওয়ায় তার গতি অনেক বেড়ে গেছে ; সে আর গজেন্দ্রগমনে চলতে চাইছে না।

উপমা দিয়ে বলতে পারি, অক্ষরবৃত্তের চাল যেন হাতির চাল ; পিঠের উপরে যুক্তাক্ষরের বাড়তি বোঝা নিয়ে সে ধীর পায়ে এগোয়। আর মাত্রাবৃত্ত যেন তেজী ঘোড়ার মতো ; সংকেত পেলেই সে যুক্তাক্ষরের শিকল ছিঁড়ে ঘাড় বেঁকিয়ে পায়ের খুরে হ্রস্বর্ণের খটাখট্‌ধ্বনি বাজিয়ে ছুটতে থাকে।

'মানসী'র দ্বিতীয় কবিতা 'ভুল ভাঙা'। তার প্রথম স্তবকেই দেখছি :

"বাহুলতা শুধু বন্ধনপাশ
বাহুতে মোর।"

'বন্ধন'কে ভেঙে এখানে চার-মাত্রার মূল্য দেওয়া হয়েছে। ছান্দসিক বলছেন, শুধু বাহুলতার বন্ধন কেন, বাংলা কবিতায় যুক্তাক্ষরের বন্ধনও এই একই সঙ্গে ভেঙে গেল।

... ...

অক্ষরবৃত্ত আর মাত্রাবৃত্তের চাল যে একেবারে আলাদা, তা আমরা বুঝতে পেরেছি। কেন আলাদা, তাও বুঝলুম। এখন, মাত্রাবৃত্তের আপন এলাকার মধ্যে যে-সব আলাদা আলাদা চাল রয়েছে, তার খবর নিতে হবে।

মাত্রাবৃত্তের চাল সাকুল্যে চার রকমের। ৪-মাত্রার চাল, ৫-মাত্রার চাল, ৬-মাত্রার চাল, আর ৭-মাত্রার চাল। অনেকে আবার ৮-মাত্রার চালের কথা বলেন। কিন্তু ৮-মাত্রার চাল যে একটা আলাদা জাতের চাল, এমন কথা মেনে নেওয়া শক্ত। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ও তাকে

আলাদা জাতের চাল বলে মেনে নেননি। আসলে, হঠাৎ দেখলে যাকে ৮-মাত্রার চাল বলে মনে হয়, পর্ব ভাঙলে বুঝতে পারি যে, সেটা ৪-মাত্রারই একটা রকমফের মাত্র, তাকে আলাদা একটা চাল বলাটা ঠিক নয়।

মূল কথায় ফিরে আসি। লাইনের এক-একটা অংশ কিংবা পর্বে মাত্রা-সংখ্যা কত, তারই হিসেব নিয়ে আমরা বলি, এটা অত মাত্রার চাল, সেটা তত মাত্রার। এবারে আসুন, মাত্রাবৃত্ত ছন্দে এমন-কিছু পদ্য বানাই, যার প্রতিটি পর্বের মাত্রা-সংখ্যা হচ্ছে চার।

কী নিয়ে পদ্য বানাব? সন্দেশ নিয়ে? বেশ, তাই হোক। ওই মহার্ঘ বস্তু মুখে তোলা যে জনসাধারণের পক্ষে কোনও কালেই খুব সহজ ছিল, এমন বলতে পারিনে, তবে চোখে অন্তত দেখা যেত। কিছুকাল আগে ছানার মিষ্টি নিষিদ্ধ হওয়ায় তাও যাচ্ছিল না। সেই-সময়কার পটভূমিকায় সন্দেশ-বিষয়ক একটি পদ্য বানানো যাক। তা আমাদের তৎকালীন বেদনার কথাটাকে আমরা এইভাবে প্রকাশ করতে পারি :

সন্দেশ চোখে দেখা ছিল সুকঠিন ;
চোখে দেখা, তাও হল নিষিদ্ধ, তাই
চক্ষুতে আসে জল, তাই রাতদিন
সন্দেশ নিয়ে শুধু পদ্য বানাই।

পদ্যটা বিশেষ জুতের হল না। না হোক, চালটা ঠিকই বুঝতে পারা যাবে। আরও ভাল করে বুঝবার জন্যে এই লাইন কটিকে পর্বে-পর্বে ভাগ করে ফেলা যাক। ভাগ করলে এর চেহারাটা এই রকমের দাঁড়ায় :

সন্দেশ/চোখে দেখা/ছিল সুক/ঠিন ;
চোখে দেখা,/তাও হল/নিষিদ্ধ,/তাই
চক্ষুতে/আসে জল,/তাই রাত/দিন
সন্দেশ/নিয়ে শুধু/পদ্য বা/নাই।

দেখা যাচ্ছে, পদ্যটির এক-এক লাইনে আমরা তিনটি করে পর্ব (এবং সেই সঙ্গে লাইনের প্রান্তে একটি ভাঙা-পর্ব) পাচ্ছি, এবং প্রতি

পর্বে পাচ্ছি চারটি মাত্রা। মাত্রাবৃত্তের ফ্যামিলিতে এ হল ৪-মাত্রার চাল।

ফি-লাইনে যে তিনটি করেই পর্ব রাখতে হবে, এমন কোনও কথা নেই। পর্বের সংখ্যা আমরা ইচ্ছে করলেই কমাতে কিংবা বাড়াতে পারি। কিন্তু চার-মাত্রার চালটা তাতে পালটাবে না। আর ফি-লাইনের শেষে যে ওই ভাঙা-পর্বটি পাচ্ছি, ওর যে কী কাজ, তা আশা করি আর নতুন করে ব্যাখ্যা করতে হবে না। অক্ষরবৃত্ত নিয়ে আলোচনার সময়েই ভাঙা-পর্বের কাজের কথাটা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। তবু, বাহুল্য হলেও আর-একবার বলি যে, ওর কাজ আর-কিছুই নয়, এক লাইন থেকে অন্য লাইনে যাবার আগে পাঠককে ও একটু দাঁড় করিয়ে রাখে; তাকে একটু দম ফেলবার ফুরসত দেয়। তা সে যাই হোক, ভাঙা-পর্বটি এ-ক্ষেত্রে ২-মাত্রার। ইচ্ছে করলে আমরা ১-মাত্রা কিংবা ৩-মাত্রার ভাঙা-পর্বও ব্যবহার করতে পারতুম।

৪-মাত্রার চালের আর-একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। এবারে যে পদ্য বানাব, তার ফি-লাইনে থাকবে ৪-মাত্রার দুটি করে পর্ব, আর সেই সঙ্গে ১-মাত্রার একটি ভাঙা-পর্ব।

সাতপাঁচ ভাবছোটা কী,
কাজে লেগে যাও বাবুজি।
ভেবে ভেবে কূল পায় কে,
অকারণে ভ্রান্তি বাড়ে।
ভাবনার কোটি হাত-পা,
লাখো মাথা, প্রকাণ্ড হাঁ।
থই পাবে, কই তার জো,
চিন্তার শেষ নেই তো।
চিন্তার নেই সীমানা,
সুতরাং চিন্তা না; না।

পর্ব ভাগ করে দেখলেই বোঝা যাবে যে, আমরা কথার খেলাপ করিনি; যে-নিয়মে লাইন বাঁধব বলেছিলুম, ঠিক সেই নিয়মেই বেঁধেছি। ভাগ করে দেখালে আমাদের লাইনগুলির চেহারা এই রকমের দাঁড়ায়:

সাতপাঁচ/ভাবছো টা/কী,
কাজে লেগে/যাও বাবু/জি।
ভেবে ভেবে/কূল পায়/কে,
অকারণে/ভ্রান্তি বা/ড়ে
ভাবনার/কোটি হাত-/পা,
লাখো মাথা,/প্রকাণ্ড/হাঁ।
থই পাবে,/কই তার/জো,
চিন্তার/শেষ নেই/তো।
চিন্তার/নেই সীমা/না,
সুতরাং/চিন্তা না;/না।

গুনে দেখুন, এর ফি-লাইনে ৪-মাত্রার দুটি করে পর্ব আছে; আর সেই সঙ্গে আছে ১-মাত্রার একটি ভাঙা-পর্ব।

৪-মাত্রার চালের আর-একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। এবারে আমাদের ফি-লাইনে থাকবে তিনটি করে পর্ব; আর ভাঙা-পর্বটি হবে ৩-মাত্রার। বিষয়: সূর্য-গ্রহণ। পদ্যটিকে আমরা এইরকমে সাজাতে পারি:

দিবাকর আজ বড় করুণার পাত্র,
চক্ষু নিবেছে তার, আলো নেই আকাশে।
নিশানাথ-সাথে নেই ভেদ লেশমাত্র,
সকালের পাগড়িতে যেন চাঁদ বাঁকা সে।

পর্ব ভেঙে দেখলে এই লাইনগুলির চেহারা এই রকমের দাঁড়ায়:

দিবাকর/আজ বড়/করুণার/পাত্র,
চক্ষু নি/বেছে তার,/আলো নেই/আকাশে।
নিশানাথ-/সাথে নেই/ভেদ লেশ/মাত্র,
সকালের/পাগড়িতে/যেন চাঁদ/বাঁকা সে।

অর্থাৎ ফি-লাইনে এখানে পর্ব আছে তিনটি করে। ভাঙা-পর্ব একটি। পর্বগুলি ৪-মাত্রার। ভাঙা-পর্বগুলিকে আমরা ৩-মাত্রার রেখেছি।

আর নয়। মাত্রাবৃত্তের এলাকায় ৪-মাত্রার চাল আমরা অনেক দেখলুম। এর পরে ৫-মাত্রার চাল দেখব। প্রসঙ্গত বলে রাখি, ভাঙা পর্বের বৈচিত্র্য আর দেখতে চাইনে। ছন্দের মূল চাল তো আর ভাঙা-

পর্বের হ্রাসবৃদ্ধির উপরে নির্ভর করে না। সুতরাং তার উপরে জোর দিয়ে লাভ নেই।

... ...

পাঁচ মাত্রার চালের মাত্রাবৃত্তের প্রতি পর্বে থাকে পাঁচটি করে মাত্রা। তবে কান পাতলেই ধরা পড়বে যে, আমরা যাকে ৫ বলছি, বস্তুত সে ৩+২। অর্থাৎ ৫-মাত্রার পব আসলে ৩-মাত্রা আর ২-মাত্রার সমষ্টি; বিজোড়-জোড়ে তার শরীর গড়া। ৪-মাত্রার ছন্দ এগোয় খটাখট খটাখট চালে; ৫-মাত্রার ছন্দ সে-ক্ষেত্রে খটাস-খট খটাস-খট ধ্বনি জাগিয়ে চলতে থাকে। নীচের লাইনগুলি লক্ষ করুন:

আসতে-যেতে|এখনো তুলি|চোখ,
রেলিঙে আর|দেখি না নীল|শাড়ি।
কোথায় যেন|জমেছে কিছু|শোক,
ভেঙেছে খেলা|সহসা দিয়ে|আড়ি।
এখন সব|স্তব্ধ নিরা|লোক;
অন্ধকারে|ঘুমিয়ে আছে|বাড়ি।

এ হল ৫-মাত্রার চাল। এর প্রতি লাইনে আছে দুটি করে পর্ব (ইচ্ছে করলেই পর্ব আরও বাড়ানো যেত); আর সেই সঙ্গে একটি ভাঙা-পর্ব। পর্বগুলি ৫-মাত্রায় গড়া; ভাঙা-পর্বটি ২-মাত্রায়। ভেঙে দেখলে এই লাইনগুলির চেহারা এইরকম দাঁড়ায়:

আসতে যেতে/এখনো তুলি/চোখ,
রেলিঙে আর/দেখি না নীল/শাড়ি।
কোথায় যেন/জমেছে কিছু/শোক,
ভেঙেছে খেলা/সহসা দিয়ে/আড়ি।
এখন সব/স্তব্ধ নিরা/লোক;
অন্ধকারে/ঘুমিয়ে আছে/বাড়ি।

৫-মাত্রার চালকে যে কেন ৩+২ মাত্রার চাল বলেছি, এখন আর সেটা বুঝতে কোনও অসুবিধে হবার কথা নয়। এ হল বিজোড়+জোড়, বিজোড়+জোড় চাল। মাত্রার হিসেবে শব্দগুলিকে যদি সেইভাবে (অর্থাৎ বিজোড়+জোড়, বিজোড়+জোড় করে) সাজানো হয়, তবে

তো কথাই নেই, ছন্দের নৌকো একেবারে তরতর করে চলবে ; তবে মাঝে-মাঝে তার অন্যথা ঘটলেও (অর্থাৎ বিজোড়-মাত্রার শব্দের পরে জোড়-মাত্রার শব্দ না-বসিয়ে তার বদলে জোড়-মাত্রার শব্দের পরে বিজোড়-মাত্রার শব্দ বসালেও) তাতে কোনও ক্ষতি হয় না। কেননা, জোড়-মাত্রার শব্দটি প্রথমে বসলেও, ছন্দের চালের তাড়নায়, সে পরবর্তী শব্দের প্রথম মাত্রাটিকে নিজের শরীরের মধ্যে টেনে আনে। (অর্থাৎ জোড়+বিজোড় তখন জোড়বি+জোড় হয়ে যায়।) দৃষ্টান্ত দিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। নীচের লাইনগুলি লক্ষ করুন :

দুপুর গেল,|বিকেল হল|সারা,
গোপনে ফোটে|একটি-দুটি|তারা,
বাতাসে যেন|চাপা বেদনা|লাগে।
বেদনা কার,|কথাটা তার|কী,
পৃথিবী তার|কিছুই বোঝে|নি ,
আকাশে বাঁকা|চন্দ্রকলা|জাগে।

পর্ব ভেঙে দেখালে এই লাইনগুলির চেহারা এইরকম দাঁড়ায় :

দুপুর গেল,/বিকেল হল/সারা,
গোপনে ফোটে/একটি-দুটি/তারা,
বাতাসে যেন/চাপা বেদনা/লাগে।
বেদনা কার,/কথাটা তার/কী,
পৃথিবী তার/কিছুই বোঝে/নি ,
আকাশে বাঁকা/চন্দ্রকলা/জাগে।

এখানে প্রতিটি পর্বেই ৫-মাত্রা গড়া হয়েছে বিজোড়+জোড় বিজোড়+জোড় দিয়ে। শুধু একটি ক্ষেত্রে—তৃতীয় লাইনের 'চাপা বেদনা'য়—তার ব্যতিক্রম দেখছি। 'চাপা বেদনা' বিজোড়+জোড় নয়, জোড়+বিজোড়। কিন্তু তাতেও কিছু অসুবিধের সৃষ্টি হচ্ছে না। কেন না, বিজোড়+জোড় এই ছন্দের তাড়নাই তাকে 'চাপাবে+দনা' বানিয়ে ছাড়ছে।

আর-একটা ব্যাপারও লক্ষ করুন। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় আর ষষ্ঠ লাইনের অন্তে যে ভাঙা-পর্ব রয়েছে, তার প্রত্যেকটিই ২-মাত্রা দিয়ে

গড়া। ব্যতিক্রম ঘটেছে চতুর্থ আর পঞ্চম লাইনের প্রান্তবর্তী ভাঙা-পর্বে। ও-দুটি পর্ব ১-মাত্রার। দেখা যাচ্ছে, একই কবিতার মধ্যে এক-এক জায়গায় আমরা এক-এক রকমের ভাঙা-পর্ব গড়লুম, কিন্তু কানের তাতে আপত্তি নেই। আসলে, জায়গা বুঝে এইভাবে ব্যতিক্রম ঘটালে কান যেমন আপত্তি তোলে না, তেমনি কবিতার শরীরে কিছুটা বৈচিত্র্যও আনা যায়। (বলেছিলুম, ভাঙা-পর্বের উপরে জোর দেব না। তবু যে একটু কারিকুরি করলুম, তার হেতুটা আর কিছুই নয়, লোভ। কারিকুরির সুযোগ পেয়ে আর ছাড়া গেল না।)

৫-মাত্রার চালের আর একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। লাইনের বিন্যাস এবারে একটু পালটে দেব। নীচের লাইনগুলি লক্ষ করুন :

কিছুটা ছিল| অন্ধকার|
কিছুটা ছিল| আলো|;
কিছুটা ছিল| শুভ্র, আর|
কিছুটা ছিল| কালো।
জীবনভোর| জ্বলেছ যার| বিষে
ওষ্ঠে তার| সুধাও ছিল| মিশে।
এবারে তবে| স্মরণে তার|
নয়নে ক্ষমা| জ্বালো—
কিছুটা ছিল| মন্দ যার,|
বাকিটা ছিল| ভালো।

এবারে আর পর্ব ভেঙে দেখাচ্ছিনে। কষ্ট করে নিজেরাই ভেঙে নিন। ভাঙলে দেখতে পাবেন, এর পর্বগুলি ৫-মাত্রার। কোনও লাইনে দুটি করে পর্ব আছে, কোনও লাইনে একটি করে। কোথাও ভাঙা-পর্ব আছে, কোথাও নেই। কিন্তু সব মিলিয়ে একটা প্যাটার্ন ঠিকই তৈরি হয়েছে।

৫-মাত্রার চাল দেখানো এখানেই শেষ হল।

... ...

পাঁচের পরে ছয়। মাত্রাবৃত্তের সংসারে এবারে ৬-মাত্রার চাল দেখ-

বার পালা। এই চালে যদি চলতে হয়, তবে পর্বে-পর্বে ছটি করে মাত্রার বরাদ্দ চাপাতে হবে। লাইনের শেষের ভাঙা-পর্বটি আমরা যেমন খুশি গড়তে পারি।

ধরা যাক, আমরা অঘ্রানের শীত নিয়ে দু-চার ছত্র লিখতে চাই। হঠাৎ বিষম ঠাণ্ডা পড়েছে, লেজ গুটিয়ে বাঘ পালাচ্ছে (ঈশ্বর জানেন পালায় কি না, কিন্তু কথাটা শোনাচ্ছে ভালো), খালবিল জমে কুলপি বরফ হয়ে যাচ্ছে (বলা বাহুল্য, বাংলাদেশে জমে না, কিন্তু লিখলে ক্ষতি কী, কবিতায় ভো শুনতে পাই সাতখুন মাফ), গাছের ডালে একটা পাখি বসে থরথর করে কাঁপছে, কবিরা এই হাড়-কাঁপানো শীতের মধ্যে হাটেমাঠে মিল খুঁজে বেড়াক, কিন্তু গৃহস্থের পক্ষে এখন জানালা-দরোজা বেশ উত্তমরূপে এঁটে রাখা দরকার—এই হবে ;আমাদের বিষয়বস্তু। তা ৫-মাত্রার চালে এই কথাগুলিকে আমরা এইভাবে সাজাতে পারি :

অঘ্রান মাসে|পড়েছে ঠাণ্ডা|বড়ো,
ব্যাঘ্র পালায়,|জমে যায় খাল|বিল ;
বৃক্ষশাখায়|বসে কাঁপে থরো|থরো
সঙ্গবিহীন|বৃদ্ধ একটি|চিল।
কবি, তুমি যাও,|হাটেমাঠে খুঁজে|মরো
দু-চারটে মন|মজানো কথায়|মিল ;
গৃহস্থ, তুমি|জানালা বন্ধ|করো,
দরোজায় বেশ|ভাল করে আঁটো|খিল।

এও মাত্রাবৃত্ত, কিন্তু, পড়লেই বুঝতে পারবেন, ৪-মাত্রা কিংবা ৫-মাত্রার চালের সঙ্গে এর মিল নেই। এর চাল হচ্ছে ৬-মাত্রার। কানে শুনেও যদি কেউ তা না-বুঝে থাকেন, তবে পর্ব ভাঙলেই ব্যাপারটা তিনি চাক্ষুষ উপলব্ধি করতে পারবেন। পর্ব ভাঙলে এই লাইনগুলির চেহারা এইরকম দাঁড়ায় :

অঘ্রান মাসে/পড়েছে ঠাণ্ডা/বড়ো,
ব্যাঘ্র পালায়,/জমে যায় খাল/বিল ;
বৃক্ষশাখায়/বসে কাঁপে থরো/থরো
সঙ্গবিহীন/বৃদ্ধ একটি/চিল।

কবি, তুমি যাও,/হাটেমাঠে খুঁজে/মরো
দু-চারটে মন-/মজানো কথার/মিল ;
গৃহস্থ, তুমি/জানালা বন্ধ/করো,
দরোজায় বেশ/ভাল করে আঁটো/খিল।

দেখতেই পাচ্ছেন, এর প্রতি লাইনে আছে দুটি করে পর্ব। (সেই সঙ্গে লাইনের প্রান্তে একটি করে ভাঙা-পর্ব রয়েছে) ; আর প্রতি পর্বে আছে ছটি করে মাত্রা (ভাঙা-পর্বগুলি দু-মাত্রার)। বলা বাহুল্য, পর্বের সংখ্যা আমরা ইচ্ছে করলেই আরও বাড়াতে পারতুম।

আর-একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। ধরা যাক, এবারে আমরা মাছ নিয়ে লিখব। তা বঙ্গদেশে আজ মাছ নিয়ে কিছু লেখা মানেই মাছ-না-থাকার কথা লেখা। মীনাভাবে হীন হয়ে আছি ; না আছে ইলিশ, না আছে পাকা রুই ; বাজারে ঢুকলে যেন কান্না পায় ; নিষ্পাদপ ভূখণ্ডে ঘাঁটকুল এরণ্ডও যেমন দ্রুমের সম্মান পায়, 'নির্মীন' বঙ্গদেশে টিলাপিয়া তেমনি আজ ফাঁকতালে আসর জমাচ্ছে। তা এই কথাগুলিকে আমরা ৬-মাত্রার চালে এমনিভাবে সাজাতে পারি :

ইলিশ, তোমাকে/দেখি না, শুধুই/
তোমার স্বপ্ন/দেখে
সপ্তাহ-মাস-/বৎসর যায়,
দুঃখে বিদরে/হিয়া।
সান্ত্বনা দিতে/নেই পাকা রুই,/
সেও বহুকাল/থেকে
নিখোঁজ, এখন/বাজার জমায় /
রাশি-রাশি টিলা/পিয়া।

লাইন আর মিলের বিন্যাসটা একটু অন্য রকমের বটে, কিন্তু এও সেই ৬-মাত্রারই চাল। পর্ব ভাঙলে এই লাইনগুলির চেহারা এই রকমের দাঁড়াবে :

ইলিশ, তোমাকে/দেখি না, শুধুই/
তোমার স্বপ্ন/দেখে
সপ্তাহ-মাস-/বৎসর যায়,/
দুঃখে বিদরে/হিয়া।

সান্ত্বনা দিতে/নেই পাকা রুই,/
সেও বহুকাল/ থেকে
নিখোঁজ, এখন/বাজার জমায়/
রাশি-রাশি টিলা/পিয়া।

দেখা যাচ্ছে, এর প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম আর সপ্তম লাইনের শেষে ভাঙা-পর্ব নেই বলেই সেখানে থেমে থাকা যাচ্ছে না, দ্রুত গিয়ে পরবর্তী লাইনে ঢুকতে হচ্ছে। সে-ক্ষেত্রে দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ আর—বলাই বাহুল্য —শেষ লাইনের শেষে ভাঙা-পর্ব আছে বলে সেখানে আমরা দাঁড়াতে পারি। আসলে ব্যাপারটা এই যে, প্রথম লাইনের সঙ্গে দ্বিতীয় লাইনকে, তৃতীয় লাইনের সঙ্গে চতুর্থ লাইনকে, পঞ্চম লাইনের সঙ্গে ষষ্ঠ লাইনকে, এবং সপ্তম লাইনের সঙ্গে অষ্টম লাইনকে আমরা অনায়াসেই জুড়ে দিতে পারতুম ; পাঠের ব্যাপারে তাতে এতটুকু ইতরবিশেষ হত না।

আর একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। এবারে আমাদের বক্তব্যকে আর-একটু উচ্চস্তরে উঠিয়ে আনব। নীচের লাইনগুলি লক্ষ করুন :

যন্ত্রণা থেকে আনন্দ জেগে ওঠে
        শোক সান্ত্বনা হয় ;
কাঁটার ঊর্ধ্বে গোলাপের মতো ফোটে
        সমস্ত পরাজয়।

এটাও যে ৬-মাত্রার চাল, সেটা বোঝাবার জন্য আশা করি আর পর্ব ভেঙে দেখাতে হবে না।

...   .

চার, পাঁচ আর ছয়ের চাল আমরা দেখেছি। এবারে ৭-মাত্রার চাল দেখবার পালা। মাত্রাবৃত্তের ঘরে এইটিই আপাতত চূড়ান্ত চাল। বাংলা কাব্যে এর দৃষ্টান্ত খুব বেশি নেই। চার, পাঁচ আর ছয়ের তুলনায় ৭-মাত্রার চালে লেখা কবিতার সংখ্যা যে অনেক কম, তাতে সন্দেহ করিনে। ৭-মাত্রার দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রকাব্যে কিছু আছে ; রবীন্দ্রনাথের পরেও অনেকে মাত্রাবৃত্তের এই চালে কবিতা লিখেছেন ; হাল-আমলের কবিরাও যে এ-চালে চলেন না, এমন নয় ; তবে তার দৃষ্টান্ত খুব বেশি চোখে পড়ে না।

দেখা যাক, আমরা এ-চালে চলতে পারি কি না। নীচের এই লাইনগুলি লক্ষ করুন :

ছিল না উদ্যত জটিল জিজ্ঞাসা,
মুক্ত অবারিত চিত্তে ছিল আশা।
নদীর কলতানে
পাখির গানে-গানে
বিশ্ব ভরা ছিল, মধুর ছিল ভাষা,
তখন বুকে ছিল গভীর ভালবাসা।

জানি না, ঠিক-চালে এই লাইনগুলিকে আপনারা পড়তে পেরেছেন কি না। না-পারলে তাতে লজ্জার কিছু নেই, বিস্ময়েরও না। কেননা হুট করে একটা নতুন চালে পা ফেলা খুবই শক্ত ব্যাপার ; যেমন ছয়ে-চারে তেমনি সাতে-পাঁচে অনেকেরই গণ্ডগোল বেধে যায়। পা যেখানে পড়বার কথা, তার কিছুটা আগে পড়লেই মুশকিল, সাতকে তখন পাঁচ বলে মনে হতে পারে। দ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে দেবার জন্যে প্রথমে এই লাইনগুলিকে পর্বে-পর্বে ভাগ করে দেখানো যাক :

ছিল না উদ্যত/জটিল জিজ্ঞাসা,/
মুক্ত অবারিত/চিত্তে ছিল আশা।/
নদীর কলতানে/
পাখির গানে-গানে/
বিশ্ব ভরা ছিল,/মধুর ছিল ভাষা,/
তখন বুকে ছিল/ গভীর ভালবাসা।/

দেখতেই পাচ্ছেন, প্রথম দ্বিতীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ লাইনের প্রত্যেকটিতে আছে দুটি করে পর্ব ; তৃতীয় ও চতুর্থ লাইনে আমরা একটি করে পর্ব রেখেছি ; লাইনের শেষে ভাঙা-পর্ব রাখিনি (ইচ্ছে করলেই রাখতে পারতুম) ; প্রতিটি পর্বই ৭-মাত্রায় গড়া। মুশকিল এই যে, ৭-মাত্রার এই পর্বগুলিকে যদি ৫ + ২ হিসেবে পড়েন, তা হলেই ধন্ধ লাগবে, মনে হবে এও (একটি পর্ব ও একটি ভাঙা-পর্ব সংবলিত) ৫-মাত্রার চাল। ধন্ধ এড়াবার জন্য একে ৩ + ৪ হিসাবে পড়া দরকার। পর্বের প্রথমাংশ (অর্থাৎ ৩-মাত্রাকে) একসঙ্গে পড়ুন, অতঃপর

দ্বিতীয়াংশ (অর্থাৎ বাকি ৪-মাত্রাকে) একসঙ্গে পড়ুন। দ্বিতীয়াংশের প্রথমে যেন একটু জোর পড়ে। তা হলে আর ভাবনা নেই; সাতে-পাঁচে গুলিয়ে না-ফেলে তখন স্পষ্ট বুঝতে পারবেন, অন্যান্য চালের সঙ্গে এর তফাতটা কোথায়। ফি মাত্রাকে যদি একটি পদক্ষেপ বলে গণ্য করি, তো ৭-মাত্রার এই চালকে 'সপ্তপদী চাল' বললে কি অন্যায় হবে?

৭-মাত্রার আর-একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। নীচের লাইনগুলি লক্ষ করুন:

কে যেন বারে বারে তার
পুরনো নাম ধরে ডাকে;
বেড়ায় পায়ে-পায়ে, আর
কাঁধের পরে হাত রাখে।
অথচ খাঁখাঁ চারিধার,
ঠাণ্ডা চাঁদ চেয়ে থাকে;
ও-হাতখানি তবে কার,
কে তবে ডাক দিল তাকে?

৭-মাত্রার চালটাকে ধরতে পারা যাতে আরও সহজ হয়, তার জন্যে আর-একটু বিশদ করে, অর্থাৎ ৭-মাত্রাকে তিনে+চারে ভাগ করে, এবারে পর্ব ভাঙছি। শুধু তাই নয়, শব্দগুলিকে কোথাও জুড়ে দিয়ে, কোথাও ভেঙে দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি, ছন্দের চাল ঠিক রাখবার জন্যে আমাদের উচ্চারণ কী রকম দাঁড়াবে:

কেযেন+বারেবারে/তার
পুরনো+নামধরে/ডাকে;
বেড়ায়+পায়েপায়ে,/আর
কাঁধের+পরেহাত/রাখে।
অথচ+খাঁখাঁচারি/ধার,
ঠাণ্ডা+চাঁদচেয়ে/থাকে;
ওহাত+খানিতবে/কার,
কেতবে+ডাকদিল/তাকে?

বলা বাহুল্য, পর্বের শারীরিক গঠনটাকে স্পষ্ট করে বোঝাবার জন্যেই এই অদ্ভুত পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছি। কবিতা পড়বার সময়

এতটাই কসরত করবার দরকার নেই। করতে গেলে শুধু ছন্দই পড়া হবে, কবিতা পড়া হবে না। সে-কথা থাক্। এবারে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারছি যে, ৭-মাত্রার চাল আসলে তিন+চারের যোগফল। এখানে ফি-লাইনে আছে ৭-মাত্রার একটি করে পর্ব ও তৎসহ দু-মাত্রার একটি করে ভাঙা-পর্ব। আশা করি, এর পরে আর ৭-মাত্রার চাল নিয়ে কারও ধন্ধ লাগবে না।

আরও একটি দৃষ্টান্ত তবু দিচ্ছি :

রাস্তা উঁচুনিচু, চলেছি সাবধানে,
বিশেষ নেই পুঁজিপাটা।
বিপদ চারিদিকে, বিঘ্ন সবখানে,
পথের সবখানে কাঁটা।

এবারে আর পর্ব ভেঙে দেখাব না। নিজেরাই ভেঙে নিন।

মাত্রাবৃত্তের আলোচনা, আপাতত, এইখানেই শেষ হল। এ ছন্দের নিয়মগুলি আপনারা জেনে নিয়েছেন। নিয়মের ব্যতিক্রমও নেহাত কম নেই। একটি ব্যতিক্রমের কথা এখানে বলি।

আমরা জেনেছি এবং দেখেছি যে, মাত্রাবৃত্ত ছন্দের বেলায় শব্দের মধ্যে কিংবা অন্তে অবস্থিত যুক্তাক্ষর দু-মাত্রার মূল্য পায়। (যদি না সেই যুক্তাক্ষরের ঠিক পূর্ববর্তী বর্ণটি হয় হস্‌বর্ণ।) যুক্তস্বর (ঐ, ঔ) অবশ্য—শব্দের মধ্যে কিংবা অন্তে থাকলে তো বটেই—আদিতে থাকলেও দু-মাত্রার মূল্য পেয়ে থাকে। সে-ক্ষেত্রে লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, শব্দের আদিতে যেখানে যুক্তস্বর, সেখানে সেই যুক্তস্বরের পাশে একটি যুক্ত-ব্যঞ্জন থাকলে তারা দুয়ে মিলে ২+২=৪ মাত্রার মূল্য আদায় করতে পারে না। একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :

দৈন্যকে কেন আর সৈন্যে সাজাও,
চৈত্রে মৈত্রী চায় পাষণ্ডেরাও।

এখন, এই যে আমরা মাত্রাবৃত্ত ছন্দে দু-লাইন লিখলুম, মাত্রাবৃত্তের নিয়ম অনুযায়ী 'দৈন্য' 'সৈন্যে' 'চৈত্রে' আর 'মৈত্রী'—এই শব্দ-

চতুষ্টয়ের প্রত্যেকেরই তো এখানে চার-মাত্রার মূল্য পাবার কথা, কিন্তু তা তারা কেউ পাচ্ছে কি ? কেউই পাচ্ছে না। প্রত্যেকেই পাচ্ছে তিন-মাত্রার মূল্য। প্রত্যেকেরই আদিতে আছে যুক্তস্বরের দাপট ও সেই যুক্তস্বরের ঠিক পাশেই আছে যুক্ত-ব্যঞ্জনের দাবি। এবং এই দুয়ের সংঘর্ষে প্রতিটি শব্দের ক্ষেত্রে একটি করে মাত্রা মারা পড়ছে। 'বৌদ্ধ' 'ঔদ্ধত্য' ইত্যাদি শব্দের বেলাতেও মাত্রাবৃত্তে একটি করে মাত্রা লোপ পেয়ে যায়। প্রশ্ন হচ্ছে, লোপ পেয়ে যায় কার হিস্যা থেকে ? অর্থাৎ সংঘর্ষের ফলে কার শক্তিক্ষয় ঘটে ? শব্দের আদিতে অবস্থিত যুক্ত-স্বরের, না তার পাশে বসা যুক্ত-ব্যঞ্জনের ? অনেকে বলবেন, আদির ওই যুক্তস্বরই এ-সব ক্ষেত্রে দুর্বল হয়ে পড়ে ও তার মাত্রামূল্য কমে যায়। আবার অনেকে হয়তো বলবেন, না, সংঘর্ষের ফলে মার খাচ্ছে ওই পাশে-বসা যুক্তাক্ষরটিই। সে-ক্ষেত্রে কেউ-কেউ আবার এমনও বলতে পারেন যে, একটু-একটু মার খাচ্ছে দুজনেই। এই তিন অভিমতের কোন্‌টা ঠিক, সেটা ধ্বনিতাত্ত্বিকের বিচার্য।*

কিন্তু না, আর নয়, মাত্রাবৃত্তের সীমানা পেরিয়ে এসেছি, এবারে আমরা স্বরবৃত্তের রাজ্যে ঢুকব।

* 'পরিশিষ্ট অংশে কবি শ্রীশঙ্খ ঘোষের চিঠি দেখুন

স্বরবৃত্ত বা দলবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ

যেমন অক্ষরবৃত্ত আর মাত্রাবৃত্তের ব্যাপারে নিয়েছি, তেমনি স্বরবৃত্তের ব্যাপারেও নাম-পরিচয়টা আগেই স্পষ্ট করে জেনে নেওরা যাক। স্বর-বৃত্ত নামটিও শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনেরই উদ্‌ভাবিত! তবে লৌকিক ছন্দ নামেও তিনি একেই বোঝাতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ সে-ক্ষেত্রে এই ছন্দকে বলতেন 'বাংলা প্রাকৃত'। শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায় বলেন শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ। স্বরবৃত্ত নামটি পরে শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়। তিনি এর নতুন নাম রাখেন দলবৃত্ত। তবে পুরনো নামটা যখন প্রসিদ্ধি পেয়েই গেছে, তখন আমরা তাকে ছাড়ছিনে, এই আলোচনায় স্বরবৃত্ত নামটাই আমরা ব্যবহার করব।

এবারে সেই স্বরবৃত্তের রাজ্যে ঢোকার পালা। বলা বাহুল্য. মাত্রাবৃত্তের এলাকায় আমরা যে-ভাবে ঢুকেছিলুম, স্বরবৃত্তের এলাকা-তেও ঠিক সেইভাবেই ঢুকব। অর্থাৎ কিনা গোত্তা মেরে হুম করে ঢুকব না। তার চাইতে বরং দূরে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণের জন্য তার চালচলন বেশ উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করব; বুঝে নেব, অক্ষরবৃত্ত আর মাত্রাবৃত্তের সঙ্গে তার গতিভঙ্গিমার তফাত কোথায়। সেটা যদি ভাল করে বুঝতে হয়, তা হলে অক্ষরবৃত্ত আর মাত্রাবৃত্তের পাশাপাশি রেখে তাকে দেখা দরকার। তাতে তুলনা করবার সুবিধা মেলে; বুঝতে পারি, কে কোনভাবে পা ফেলে হাঁটছে। ছন্দ-বিচারে অবশ্য দেখার মূল্য যৎসামান্য, শোনার মূল্যই বেশি। যার চলন দেখতে চাই, আসলে তাকে বাজিয়ে দেখতে হবে। আসুন, অক্ষরবৃত্ত মাত্রাবৃত্ত আর স্বরবৃত্তকে তা হলে পাশা-পাশি বাজিয়ে দেখা যাক।

ধরা যাক্, আমরা ভোজন-পর্ব নিয়ে কিছু লিখতে চাই। দিনকাল যা পড়েছে, তাতে সত্যি তো আর ভোজনের সাধ মেটাবার উপায় নেই, এখন শুধু পদ্য বেঁধেই শখ মেটাতে হবে। তা কথা এই যে, শখটা তিন রকমের ছন্দেই মেটাতে পারি। প্রথমত লিখতে পারি :

দক্ষিণহস্তের ক্রিয়া জমে পরিপাটি
পলান্নের সঙ্গে পেলে কোর্মা এক বাটি।

বুঝতেই পারছেন, এ হল অক্ষরবৃত্ত ছন্দ। ছন্দ পাল্‌টে এবারে আর-এক রকমের দোলা লাগিয়ে এই কথাগুলিকে প্রকাশ করা যাক। লেখা যাক :

দাও যদি/পলান্ন, সাথে এক বাটি
কোর্মা দিলেই
ভোজনের পর্বটা জমে পরিপাটি—
সন্দেহ নেই।

এ হল মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। (চালটা এ-ক্ষেত্রে ৪-মাত্রার।) এবারে পুনশ্চ ছন্দ পাল্‌টে এই কথাগুলিতে আমরা আর-এক রকমের দোলা লাগাব। লিখব :

আহার জমে পরিপাটি
সত্যি বলি ভাই
পলান্ন আর একটি বাটি
কোর্মা যদি পাই।

এ হল স্বরবৃত্ত। অক্ষরবৃত্ত আর মাত্রাবৃত্তের পাশাপাশি একে পড়ুন। তা হলেই বুঝতে পারবেন যে, এর চলন একেবারে আলাদা।

আবার দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। এবারে কী নিয়ে লিখব? ফুর্তির কথা তো লিখলুম, এবারে অন্য-কিছু লেখা যাক। বক্তব্যকে আর-একটু উঁচুতে উঠিয়ে এনে, আসুন, হৃদয়ঘটিত কিছু লিখি। পর-পর তিন রকমের ছন্দে সে-কথা লেখা হবে।

(১) অক্ষরবৃত্ত

ঘৃণায় বিঁধেছ যাকে,|দিয়েছ ধিক্কার,
আহ্বান জানালে তাকে|মিথ্যে কেন|আর?

(২) মাত্রাবৃত্ত (৫-মাত্রা)

ঘৃণাতে যাকে বিঁধেছ, যাকে
বলেছ শুধু ছি-ছি,
সহসা কেন এখানে তাকে
ডেকেছ মিছিমিছি ?

(৩) স্বরবৃত্ত

ঘৃণা করো যে-লোকটাকে
শুধুই বলো ছি-ছি,
আবার তুমি কেন তাকে
ডাকলে মিছিমিছি ?

দেখতেই পাচ্ছেন, মোটামুটি একই কথাকে আমরা তিন রকমের ছন্দে বাঁধলুম। পাশাপাশি এদের বারকয়েক পড়ে দেখুন। পড়তে গেলেই বুঝতে পারবেন, তৃতীয় ছন্দটির অর্থাৎ স্বরবৃত্তের চাল আগের দুটির কোনওটির সঙ্গেই মেলে না। এর পা ফেলবার ভঙ্গি একেবারেই আলাদা।

আবার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। উদর থেকে যখন হৃদয়ে একবার প্রোমোশান পেয়েছি, তখন বক্তব্য নির্বাচনে আর সহসা আমরা লঘুচিত্ততার পরিচয় দিচ্ছিনে। ধরা যাক, কোনও-এক খণ্ডিতা নায়িকার নিরুদ্ধ বেদনার কথাকে আমরা প্রকাশ করতে চাই। তা তিন রকমের ছন্দেই সে-কথা প্রকাশ করা চলে। যদি অক্ষরবৃত্তে প্রকাশ করতে হয়, তো আমরা লিখব :

মুখে তার কথা নেই শয্যার উপরে
সমস্ত না-বলা কথা অশ্রু হয়ে ঝরে।

চাল পালটে যদি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে এই কথাগুলি জানাতে হয়, তো সে-ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি :

মুখে কথা নেই ভীরু নায়িকার,
বিনিদ্র বিছানায়
না-বলা কথার যন্ত্রণা তার
অশ্রুতে ঝরে যায়।

এ হল ছয়ের চালের মাত্রাবৃত্ত। আবার এই একই কথাকে আমরা স্বরবৃত্তের সুতোতেও গেঁথে তুলতে পারি। সে-ক্ষেত্রে আমরা লিখব :

একটি কথা নেই মুখে তার
সঙ্গিবিহীন ঘরে
রুদ্ধ কথার যন্ত্রণাভার
অশ্রু হয়ে ঝরে।

অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত আর স্বরবৃত্তের চাল যে সম্পূর্ণ পৃথক, আশা করি সেটা ইতিমধ্যে নিঃসংশয়ে বুঝে নিয়েছেন। এই পার্থক্যের মূলে রয়েছে এদের নিজস্ব গঠন-রীতি। তাকে বিশ্লেষণ করলেই ধরা পড়বে, এদের চলন কেন আলাদা।

অক্ষরবৃত্ত আর মাত্রাবৃত্তের গঠন-রীতি ইতিপূর্বেই আমরা বিশ্লেষণ করেছি। করে একটা মোটামুটি নিয়মের হদিস পেয়েছি। সেটা এই যে, (১) অক্ষরবৃত্তে সাধারণত প্রতিটি অক্ষর একটি করে মাত্রার মূল্য পায়, এবং (২) মাত্রাবৃত্তে প্রতিটি অক্ষর তো একটি করে মাত্রার মূল্য পায়ই, প্রতিটি যুক্তাক্ষর (যদি সেই যুক্তাক্ষর শব্দের আদিতে না থাকে, কিংবা শব্দের মধ্যে অথবা অন্তে থাকলেও তার পূর্ববর্তী বর্ণটি যদি হস্‌বর্ণ না হয়) পায় দু-মাত্রার মূল্য।

স্বরবৃত্তে সে-ক্ষেত্রে প্রতিটি সিলেব্‌ল্‌কে একটি করে মাত্রার মূল্য চুকিয়ে দিতে হয়।

সিলেব্‌ল্‌-এর বাংলা প্রতিশব্দ কী করব? সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত করেছিলেন 'শব্দ-পাপড়ি' ; কালিদাস রায় করেছেন 'পদাংশ' ; প্রবোধচন্দ্র 'দল'-এর পক্ষপাতী। 'পাপড়ি' আর 'দল'-এর অর্থ একই। অনুমান করতে পারি, সত্যেন্দ্রনাথ আর প্রবোধচন্দ্র শব্দকে পুষ্প হিসেবে দেখেছেন ; সিলেব্‌ল্‌ তার পাপড়ি কিংবা দল। (কট্টর নৈয়ায়িকেরা সম্ভবত এইটুকু শুনেই ভ্রূকুটি করে বলে বসবেন যে, শব্দকোষে সে-ক্ষেত্রে আর যে-পুষ্পই থাক্‌, শতদলের সন্ধান মিলবে না, কেননা, এক শ সিলেব্‌ল্‌ দিয়ে যার অঙ্গ গড়া, এমন শব্দ ন ভূতো ন ভবিষ্যতি।)

কিন্তু সে-কথা পরে। সিলেব্‌ল্‌ই বলি, কিংবা পাপড়ি অথবা দলই

বলি, বস্তুটা আসলে কী, আগে সেটা বোঝা চাই।

এক কথায় বলতে পারি, কোনও-কিছু উচ্চারণ করতে গিয়ে ন্যূনতম চেষ্টায় যেটুকু আমরা বলতে পারি, তা-ই হচ্ছে একটি সিলেব্‌ল্‌। সেই দিক থেকে এক-একটি সিলেব্‌ল্‌ হচ্ছে আমাদের উচ্চারণের এক-একটি ইউনিট কিংবা একক। এই এককগুলির সমবায়েই আমাদের উচ্চারণের শরীর গড়ে ওঠে। দৃষ্টান্ত দিয়ে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিচ্ছি।

ধরা যাক, 'কবিকঙ্কণ' শব্দটাকে আমরা উচ্চারণ করতে চাই। করলুম। করে দেখতে পাচ্ছি, চারটি এককে তার অঙ্গ গড়া। আলাদা করে সেগুলিকে এইভাবে দেখানো যায় :

ক + বি + কং + কণ্‌

অর্থাৎ 'কবিকঙ্কণ' শব্দটি মোট চারটি সিলেব্‌ল্‌-এর সমবায়ে গড়ে উঠেছে।

এই হিসেবে 'ছন্দ' শব্দটিতে আছে দুটি সিলেব্‌ল্‌ (ছন্‌ + দ) ; আবার—অক্ষরের সংখ্যা যদিও বাড়ল—'বন্ধন' শব্দটিতেও দুটির বেশি সিলেব্‌ল্‌ নেই (বন্‌ + ধন্‌)।

এই পর্যন্ত যা বলেছি, তার থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, সিলেব্‌ল্‌ দু-রকমের হতে পারে। ইংরেজিতে বলে 'ওপ্‌ন্‌ সিলেব্‌ল্‌' ও 'ক্লোজ্‌ড্‌ সিলেব্‌ল্‌'। প্রবোধচন্দ্র তো সিলেব্‌ল্‌ শব্দটার বাংলা করেছেন 'দল', সেই হিসেবে 'ওপ্‌ন সিলেব্‌ল্‌' ও 'ক্লোজ্‌ড্‌ সিলেব্‌ল্‌'কে তিনি 'মুক্তদল' ও 'রুদ্ধদল' বলেন। 'কবিকঙ্কণ' শব্দটার মধ্যে 'ক' আর 'বি' হচ্ছে মুক্ত সিলেব্‌ল্‌ ; অন্য দিকে 'কং' আর 'কণ' হচ্ছে রুদ্ধ। 'রুদ্ধ' বলছি এইজন্য যে, 'ক' আর 'বি'র মতো এ-দুটি সিলেব্‌ল্‌-এর উচ্চারণকে টেনে নিয়ে যাওয়া যায় না। 'ভাই' 'বউ' 'যাও' ইত্যাদিও রুদ্ধ সিলেব্‌ল্‌-এর দৃষ্টান্ত। এ-সব সিলেব্‌ল্‌-এর শেষে যদিও স্বরবর্ণ আছে, তবু—উচ্চারণ যে-হেতু তন্মুহূর্তেই ফুরিয়ে যায়, তাই—কার্যত সেই স্বরবর্ণগুলি হসন্ত বর্ণেরই সামিল, ফলে এরাও রুদ্ধ সিলেব্‌ল্‌ বলে গণ্য হয়। ('যায়', 'হায়' ইত্যাদির ক্ষেত্রে তো সেই এক কথা বটেই, 'যাঃ' 'বাঃ' ইত্যাদিও রুদ্ধ সিলেব্‌ল্‌।)

ইতিপূর্বে বলেছি, স্বরবৃত্ত ছন্দে সিলেব্‌ল্‌-এর হিসেবে মাত্রার মূল্য চুকিয়ে দিতে হয় ; ফি সিলেব্‌ল্‌কে দিতে হয় একটি করে মাত্রার মূল্য। সে-ক্ষেত্রে এই রীতিতে দেখা যাচ্ছে মাত্রা-সংখ্যার দিক থেকে 'ছন্দ' আর 'বন্ধন' তুল্যমূল্য শব্দ ; কেননা অক্ষর-সংখ্যায় পৃথক হয়েও সিলেব্‌ল্‌-সংখ্যায় তারা সমান, তাদের দুজনেরই শরীর দুটি করে সিলেব্‌ল্‌ দিয়ে গঠিত হয়েছে।

অক্ষরবৃত্ত আর মাত্রাবৃত্তের সঙ্গে স্বরবৃত্তের প্রধান পার্থক্য এইখানেই। ধ্বনিটাই অবশ্য প্রধান কথা, অক্ষর নেহাতই গৌণ ব্যাপার। সে-কথা আগেও অনেকবার বলেছি। তবু, প্রথম দুটি ছন্দের ক্ষেত্রে অক্ষরও একেবারে ন-গণ্য নয়। ব্যতিক্রমের কথা যদি ছেড়ে দিই, তবে অক্ষরের ভিত্তিতেও মাত্রার একটা মোটামুটি হিসেব সেখানে রাখা চলে। স্বরবৃত্তে সেটা একেবারেই চলে না। একই শব্দ যে এই তিন রকমের ছন্দে কীভাবে তিন রকমের মাত্রামূল্য পায়, কবিকঙ্কণের 'কঙ্কণ' দিয়েই সেটা বুঝিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

(১) অক্ষরবৃত্তে সাধারণত প্রতিটি অক্ষরই একটি করে মাত্রার মূল্য পায়। সুতরাং 'কঙ্কণ' সেখানে ৩ মাত্রার শব্দ।

(২) মাত্রাবৃত্তে আমরা সাধারণত প্রতিটি অক্ষরকে একটি করে মাত্রার মূল্য দিই, কিন্তু শব্দের মধ্যস্থ কিংবা প্রান্তবর্তী যুক্তাক্ষরকে (যদি না সেই যুক্তাক্ষরের ঠিক পূর্ববর্তী বর্ণটি হয় হস্‌বর্ণ) দিই ২ মাত্রার মূল্য। সুতরাং 'কঙ্কণ' সেখানে ৪-মাত্রার শব্দ।

(৩) স্বরবৃত্তে আমরা প্রতিটি সিলেব্‌ল্‌কে একটি করে মাত্রার মূল্য দিই, এবং 'কঙ্কণ' শব্দটিতে মোট দুটি সিলেব্‌ল্‌ (কং + কণ্‌) পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং 'কঙ্কণ' সেখানে ২-মাত্রার শব্দ।

অর্থাৎ কিনা একই শব্দ তিন রকমের ছন্দে তিন রকমের মাত্রামূল্য পাচ্ছে।

পদ্যের মাধ্যমে দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা আরও পরিষ্কার হবে। পরপর তিন রকমের ছন্দে আমরা মোটামুটি একই বক্তব্যকে এখানে উপস্থিত করছি :

(১) অক্ষরবৃত্ত

অঙ্কের দা|পটে কাব্য|নাভিশ্বাস|ছাড়ে,
আনন্দের|লেশ নেই|ছন্দের বি|চারে।

(২) মাত্রাবৃত্ত (৬-মাত্রা)

অঙ্কের চোখ|রাঙানিতে|হায়,
নাড়ি ছাড়ে|কাব্যের,
ছন্দ-বিচারে|বলো কেবা|পায়
স্পর্শ|আনন্দের ?

(৩) স্বরবৃত্ত

অঙ্ক কষে কিচ্ছু পেলে ?
কাব্য গেল মরে।
আনন্দের কি পরশ মেলে
ছন্দ-বিচার করে ?

কথাটা, বলাই বাহুল্য, সত্যি নয়। কেননা, ছন্দ-বিচারেও আনন্দ মেলে বই কী। কিন্তু সে-তর্ক পরে হলেও ক্ষতি নেই। আপাতত লক্ষ করে দেখুন, 'আনন্দের' শব্দটি তিনটি দৃষ্টান্তেই আছে। কিন্তু তিন জায়গায় তার মাত্রামূল্য সমান নয়। প্রথম দৃষ্টান্তে (অর্থাৎ অক্ষরবৃত্তে) সে পাচ্ছে ৪-মাত্রার মূল্য ; দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে (অর্থাৎ মাত্রাবৃত্তে) সে পাচ্ছে ৫-মাত্রার মূল্য ; আবার তৃতীয় দৃষ্টান্তে (অর্থাৎ স্বরবৃত্তে) সে মাত্র ৩-মাত্রার মূল্য পেয়েই খুশি থাকছে।

স্বরবৃত্তে সে মাত্র ৩-মাত্রার মূল্য পাচ্ছে কেন ? কারণটা আগেই বলেছি। পাচ্ছে, তার কারণ, স্বরবৃত্তে মাত্রার মূল্য দেওয়া হয় সিলেব্‌ল্ অনুযায়ী, এবং 'আনন্দের' শব্দটিতে (আ + নন্ + দের্) তিনটির বেশি সিলেব্‌ল্ নেই।

এবারে আমরা স্বরবৃত্তের পর্ব-বিভাগ করে দেখাব। সিলেব্‌ল্ অনুযায়ী মাত্রার মূল্য দেবার ব্যাপারটা তাতে আরও স্পষ্ট হবে। কিন্তু পর্ব ভেঙে দেখাবার জন্যে একটা পদ্য চাই। হাতের কাছে পদ্যের বই পাচ্ছিনে ; তাই, আসুন, স্বরবৃত্ত ছন্দে লেখা লাইন কয়েকের একটা

টুকরো-পদ্য নিজেরাই বানিয়ে নেওয়া যাক। ভয় পাবার কিছু নেই, অক্ষরবৃত্ত আর মাত্রাবৃত্ত ছন্দে তো আর আমরা কম পদ্য বানাইনি, কান যদি ঠিক থাকে তো স্বরবৃত্তেও কয়েকটা লাইন আমরা ঠিকই খাড়া করে ফেলতে পারব।

ধরা যাক, আমাদের বক্তব্য এই হবে যে, রেলের কামরায় অকস্মাৎ এক পুরনো বন্ধুর (কিংবা বান্ধবীর) সঙ্গে দেখা হয়েছে, খানিক বাদেই আবার ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে, দুজনে দু-পথে চলে যাব, কিন্তু সেই বিচ্ছেদের ভাবনাকে আমরা আমল দিতে চাইনে, বরং দু-দণ্ডের এই হঠাৎ-মিলনকে গল্পে-গল্পে ভরিয়ে তুলতে চাই। তা স্বরবৃত্তে সেই কথা-টাকে আমরা এইভাবে প্রকাশ করতে পারি :

পথের মধ্যে হঠাৎ দেখা,
ট্রেনের মধ্যে আলাপচারি ;
স্টেশন এলেই আবার একা
অন্য পথে দেব পাড়ি।
সেটা সত্যি, কিন্তু অত
ভেবে দেখলে কষ্ট বড ;
বরং এসো, আপাতত
হাল্‌কা কিছু গল্প করো।

যাক, লাইনগুলি মোটামুটি খাড়া হয়েছে। এবারে একে পর্বে-পর্বে ভাগ করতে হবে। সে-ক্ষেত্রে এর চেহারা দাঁড়াবে এইরকম :

পথের মধ্যে/হঠাৎ দেখা,/
ট্রেনের মধ্যে/আলাপচারি ;/
স্টেশন এলেই/আবার একা/
অন্য পথে/দেব পাড়ি।/
সেটা সত্যি,/কিন্তু অত/
ভেবে দেখলে/কষ্ট বড ;/
বরং এসো,/আপাতত/
হাল্‌কা কিছু/গল্প করো।/

দেখতে পাচ্ছি, এখানে ফি-লাইনে আছে দুটি করে পর্ব (সংখ্যা-

টাকে ইচ্ছে করলেই বাড়ানো যেত) ; লাইনের শেষে ভাঙা-পর্ব নেই (ইচ্ছে করলেই রাখা যেত)।

লাইন তো ভাঙলুম। এখন পর্বকেও যদি ভেঙে দেখি, তা হলে তার মধ্যে চারটি করে সিলেব্‌ল্-এর সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রথম লাইনের প্রথম পর্বটিকে ভেঙে দেখছি, প + থের্ + মধ্ + ধে—এই চারটি সিলেব্‌ল্-এ তার শরীর গড়া। অন্য ক্ষেত্রেও এর অন্যথা হবে না, যে-কোনও পর্ব এখানে ভাঙি না কেন, মোট চারটি করে সিলেব্‌ল্ই তাতে মিলবে।

এবং আপনারা আগেই জেনেছেন যে, স্বরবৃত্ত ছন্দে প্রতিটি সিলেব্‌ল্ একটি করে মাত্রার মূল্য পায়। সেই হিসেবে আমরা বলতে পারি যে, স্বরবৃত্তের চাল ৪-মাত্রার। মাত্রাবৃত্ত অনেক চালে চলে। কিন্তু স্বরবৃত্তের এই একটিই চাল। চারের চাল ছাড়া সে চলে না।

আর-একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। এবারে আমাদের বিষয়বস্তু হবে ভালবাসা। একটি মেয়ের চাউনিতে আলো জ্বলেছে, হাসিতে রঙ ধরেছে, অথচ ভঙ্গিটি সলজ্জ। তার বুকের মধ্যে জেগেছে অসম্ভবকে জয় করবার আশা ; অন্য দিকে, দ্বিধা আর ভয়ের শিকলটাকেও সে ছিঁড়তে পারছে না। অর্থাৎ কিনা সে প্রেমে পড়েছে। তা তার এই অবস্থাটাকে আমরা, স্বরবৃত্ত ছন্দে, এইভাবে প্রকাশ করতে পারি :

দুটি চোখে | কে ওই আলো | জ্বালে,
ঠোঁটে লাগায় হাসি ?
ভঙ্গিতে কে | অমন করে | ঢালে
লজ্জা রাশি | রাশি ?
বুকের মধ্যে | বাজায় গুরু | গুরু
অসম্ভবের আশা ; |
ভয়ে তবু | কাঁপে যে তার | ভুরু,
সেই তো ভালবাসা।

ঈশ্বর জানেন, প্রথম-প্রেমের এই বর্ণনাটা সকলের মনঃপূত হল কি না। তবে এও যে স্বরবৃত্তই, তাতে সন্দেহ নেই। পর্ব ভেঙে দেখালে

এর চেহারা হবে এইরকম :

দুটি চোখে/কে ওই আলো/জ্বালে,
ঠোঁটে লাগায়/হাসি ?
ভঙ্গিতে কে/অমন করে/ঢালে
লজ্জা রাশি/রাশি ?
বুকের মধ্যে/বাজায় গুরু/গুরু
অসম্ভবের/আশা ;
ভয়ে তবু/কাঁপে যে তার/ভুরু,
সেই তো ভাল/বাসা।

দেখতে পাচ্ছি, এর প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম আর সপ্তম লাইনে আছে দুটি করে পর্ব ; দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ আর অষ্টম লাইনে সে-ক্ষেত্রে একটি করে পর্ব আছে। ফি-লাইনের শেষে আমরা ভাঙা-পর্ব রেখেছি। প্রতিটি পর্বই ৪-মাত্রায় গড়া (অর্থাৎ প্রতিটি পর্বেই চারটি করে সিলেব্‌ল্‌ আছে)। ভাঙা পর্বগুলি ২ মাত্রার।

আরও একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। এবারে আমাদের বিষয়বস্তু হচ্ছে অকৃতজ্ঞতা। প্রেম-ভালবাসা-প্রকৃতির কথা তো অনেক বললুম, এবারে জীবনের অন্ধকার দিকটার দিকেও একবার তাকানো যাক। যুগপৎ অকৃতজ্ঞ ও নির্বোধ এমন মানুষের কথা বলা যাক, নিজের ক্ষমতার দৌড় না-বুঝেই যে কিনা উপকারীকে দংশন করতে উদ্যত :

চেহারাটা আজকে তোমার
এক মুহূর্তে পড়ল ধরা।
হাঁড়ির মধ্যে আটকা ছিলে
যেই না খুলে দিলুম সরা—
অমনি তুমি আমার দেহেই
সমস্ত বিষ ঢালতে চাচ্ছ,
সাপের মতই ফণা তুলে
দিব্যি তুমি ফোঁসফোঁসাচ্ছ।
কৃতজ্ঞতা কিচ্ছু নেই কি ?
বুদ্ধি ? তাও না ? আরে ছি-ছি

বুদ্ধি থাকলে বুঝতে পারতে
ভয় দেখাচ্ছ মিছিমিছি।
সাপের ওষুধ আছে আমার,
কোরো না তাই বাড়াবাড়ি।
তোমার মতন হাজার সাপকে
হাঁড়িতে ফের পুরতে পারি।

এবারে আর পর্ব ভেঙে দেখাচ্ছিনে। নিজেরাই ভেঙে নিন। ভাঙলে দেখতে পাবেন, এর ফি-লাইনে দুটি করে পর্ব আছে (লাইনের শেষে ভাঙা-পর্ব নেই)। প্রতি পর্বে, যথারীতি, আছে চারটি করে সিলেব্‌ল্।

কথা এই যে, স্বরবৃত্ত ছন্দে ৪-সিলেব্‌ল্-এর পর্বটাই নিয়ম বটে, তবে মাঝে-মাঝে তার ব্যতিক্রমও ঘটে যায়। আমরা তিনটি মুক্ত ও একটি রুদ্ধ সিলেব্‌ল্-এর সমবায়ে পর্ব গড়তে পারি (দৃষ্টান্ত: "দিনের আলো" = দি/নের্/আ/লো), কিংবা চারটি মুক্ত সিলেব্‌ল্-এর সমবায়ে পর্ব গড়তে পারি (দৃষ্টান্ত: "নিভে এলো" = নি/ভে/এ/লো), কিংবা দুটি মুক্ত ও দুটি রুদ্ধ সিলেব্‌ল্-এর সমবায়েও পর্ব গড়তে পারি (দৃষ্টান্ত: "বাইরে কেবল" = বাই/রে/কে/বল্)। এই সবই চার-সিলেব্‌ল্-সম্পন্ন পর্বের দৃষ্টান্ত। কিন্তু সবগুলি সিলেব্‌ল্‌কেই যদি রুদ্ধ রাখতে ইচ্ছা করি, তা হলে পর্বের মধ্যে সাকুল্যে তিনটির বেশি সিলেব্‌ল্ ঢোকাতে গেলে আমাদের ঘাম ছুটে যাবে। (দৃষ্টান্ত দেবার জন্যে এক্ষুনি :একটা লাইন বানিয়ে নেওয়া যাক্। "শন্ শন্ শন্ বাতাস বইছে"—এই যে লাইনটি, এর মধ্যে দুটি পর্ব আছে। "শন্ শন্ শন্" আর "বাতাস বইছে"। তার মধ্যে প্রথম পর্ব অর্থাৎ "শন্ শন্ শন্"-এর সবকটি সিলেব্‌ল্‌ই যেহেতু রুদ্ধ, তাই সেই পর্বের মধ্যে সাকুল্যে তিনটির বেশি সিলেব্‌ল্-এর জায়গা মেলেনি; মেলানো শক্ত।) তা হলেই দেখা যাচ্ছে, ৪-মাত্রার নিয়মটা সর্বদা বজায় থাকে না; সিলেব্‌ল্-এর চরিত্র অনুযায়ী মাত্রার সংখ্যা বাড়ে কমে। এখানে যে দৃষ্টান্ত দিয়েছি, তা ছাড়া অন্য প্রকারের ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্তও এই ছন্দে বিস্তর মেলে। যেমন মাত্রাহ্রাস, তেমনি মাত্রাবৃদ্ধির দৃষ্টান্তও প্রচুর। স্বরবৃত্তের আর-এক নাম ছড়ার ছন্দ। তা

চোখ বুলোলেই ধরা পড়বে যে, সেকাল আর একালের অনেক ছড়ারই অনেক পর্বে চারটি করে সিলেব্‌ল্‌ নেই। কোথাও বেশি আছে, কোথাও কম।

স্বরবৃত্ত ছন্দে একালেও কিছু কম কবিতা লেখা হয়নি। কিন্তু একালের কবিরাই যে পর্বে-পর্বে চারটি করে সিলেব্‌ল্‌-এর বরাদ্দ চাপাবার কানুন সর্বদা মান্য করছেন, এমনও বলতে পারিনে। ব্যতিক্রম বিস্তর চোখে পড়ে। আকছার দেখতে পাই, পর্বে কোথাও সিলেব্‌ল্‌-এর সংখ্যা চারের বেশি, কোথাও কম। সিলেব্‌ল্‌-এর সংখ্যা যখন বাড়ে, তখন পাঁচে, এমন কী এক-আধ ক্ষেত্রে ছয়েও গিয়ে পৌঁছয় (প্রাচীন ছড়ায় ছয়-সিলেব্‌ল্‌ যুক্ত পর্বের দৃষ্টান্ত : কাজিফুল 'কুড়োতে কুড়োতে' পেয়ে গেলাম মালা)। যখন কমে, তখন সাধারণত তিনে এসে নামে।

ওঠানামার ব্যাপারটা কি কবিদের ইচ্ছাকৃত ? অর্থাৎ চার-সিলেব্‌ল্‌ দিয়ে স্বরবৃত্তের পর্ব গড়বার যে একটি অলিখিত বিধান রয়েছে, সেইটেকে লঙ্ঘন করবার জন্যেই কি তাঁরা মাঝে-মাঝে সিলেব্‌ল্‌-এর সংখ্যা বাড়ান কিংবা কমান ? উত্তরটা কবিরাই দিতে পারবেন। আমরা শুধু এইটুকু বলতে পারি যে, নিয়ম লঙ্ঘন করলেও তাঁরা সাধারণত এক-পায়ের বেশি লঙ্ঘন করেন না। চারের সীমানা ছাড়িয়ে যখন তাঁরা ওপরে ওঠেন, তখন বড়জোড় এক-পা ওঠেন। এবং যখন নামেন, তখন সাধারণত এক-পা-ই নামেন। (নামতে নামতে তু'য়ে নামবার দৃষ্টান্তও কিছু আছে।)

সীমানা ছাড়িয়ে ওপরে উঠবার দৃষ্টান্তই আগে দেওয়া যাক। বিখ্যাত কিছু পদ্য কিংবা ছড়া থেকে দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। (হাতের কাছে বই না-থাকায় মিলিয়ে নেবার উপায় নেই। উদ্ধৃতিতে যদি একটু-আধটু ভুল ঘটে যায়, সহৃদয় পাঠক আশা করি ক্ষমা করবেন।) নীচের লাইন দুটি লক্ষ করুন :

"রাত পোহালো, ফরসা হোলো, ফুটলো কত ফুল ;
কাঁপিয়ে পাখা নীল পতাকা জুটল অলিকুল।"

এখানে ফি-লাইনে আছে তিনটি করে পর্ব। লাইনের শেষে ভাঙা-পর্বও আছে। প্রতিটি পর্বে চারটি করে সিলেব্‌ল্‌ থাকবার কথা।

আছেও। শুধু দ্বিতীয় লাইনের প্রথম পর্বে ব্যতিক্রম ঘটেছে। পর্বটি হল 'কাঁপিয়ে পাখা'। হিসেব করে দেখুন, সিলেব্‌ল্‌-এর সংখ্যা এক্ষেত্রে চার নয়, পাঁচ।

আর-একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :

"জাদুর গুণের বালাই নিয়ে মরে যেন সে কাল!"

এটিও আপনাদের চেনা লাইন। এতেও আছে তিনটি পর্ব আর একটি ভাঙা-পর্ব। কিন্তু তৃতীয় পর্বে ('মরে যেন সে') সিলেব্‌ল্‌ রয়েছে চারের বদলে পাঁচটি।

আর-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় :

"যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে।"

এ-লাইনটিও আপনারা অনেকবার শুনেছেন। কিন্তু এর প্রথম পর্বে ('যমুনাবতী') যে পাঁচটি সিলেব্‌ল্‌ রয়েছে, তা হয়তো সবাই খেয়াল করে দেখেননি। ঠিক তেমনি, 'পূজাবাটীতে জোর কাঠিতে' যখন ঢাক বাজে, তখনও অনেকেই খেয়াল করে দেখেন না যে, 'পূজাবাটীতে' পুরো পাঁচটি সিলেব্‌ল্‌ গিয়ে ঢুকেছে।

ইতিপূর্বে আমরা স্বরবৃত্তের যে-সব দৃষ্টান্ত নিজেরা তৈরি করে নিয়েছিলুম, তাতে অবশ্য কুত্রাপি কোনও ব্যতিক্রম ছিল না। কিন্তু থাকলেই কি তাতে স্বরবৃত্তের পবিত্রতা নষ্ট হত ? ট্রেনের-মধ্যে-হঠাৎ-দেখতে-পাওয়া বন্ধুটির সঙ্গে খানিক বাদেই ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে, এই কথাটা জানিয়ে আমরা লিখেছিলুম :

সেটা সত্যি, কিন্তু অত
ভেবে দেখলে কষ্ট বড়।

সে-ক্ষেত্রে ভেবে না-দেখে আমরা যদি তলিয়ে দেখতুম, এবং লিখতুম :

সেটা সত্যি, কিন্তু অত
তলিয়ে দেখলে কষ্ট বড়।

তা হলেই ব্যতিক্রম ঘটত, এবং দ্বিতীয় লাইনের প্রথম পর্বে ('তলিয়ে দেখলে') পাঁচটি সিলেব্‌ল্‌ ঢুকে পড়ত। কিন্তু স্বরবৃত্তের চাল যে তাই বলে নষ্ট হত, এমন মনে হয় না।

নষ্ট হয় না সিলেব্‌ল্‌-এর সংখ্যা কমে গেলেও। ঊর্ধ্বগতির কথা তো বললুম। নিম্নগতির ক্ষেত্রেও সেই একই কথা। চারের বদলে তিন সিলেব্‌ল্‌ দিয়েও মাঝে-মাঝে স্বরবৃত্তের পর্ব গড়া হয়েছে, কিন্তু ছন্দের রেলগাড়ি তাতে বেলাইন হয়নি। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :

"আজ রামের অধিবাস কাল রামের বিয়ে।"

এটিও একটি সুপরিচিত লাইন, এবং এও স্বরবৃত্তই। লাইনটিতে মোট তিনটি পর্ব, আর তৎসহ একটি ভাঙা-পর্ব রয়েছে। কিন্তু তিনটি পর্বের প্রত্যেকটিই এখানে তিন-সিলেব্‌ল্‌ দিয়ে গড়া (আজ রামের/ অধিবাস/কাল রামের)।

আর-একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :

"গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে।"

এটিও একটি পরিচিত ছড়ার লাইন। এরও দ্বিতীয় পর্বে ('ভাই আমার') আর তৃতীয় পর্বে ('মন কেমন') আছে তিনটি করে সিলেব্‌ল্‌।

আরও একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। এবারে দু-লাইন নিজেরাই বানিয়ে নিচ্ছি :

রাতদিন তুই ছাইভস্ম কা সে
কথা বলিস নিজের সঙ্গে নিজে !

লাইন দুটির প্রত্যেকটিতে আছে দুটি করে পর্ব আর একটি করে ভাঙা-পর্ব। লক্ষ করে দেখুন, প্রথম লাইনের দুটি পর্বই (রাতদিন তুই/ছাইভস্ম) গড়া হয়েছে তিনটি করে সিলেব্‌ল্‌ দিয়ে।* কিন্তু ছন্দ তাতে বেচাল হয়নি।

* 'রাতদিন তুই'-পর্বটির তিনটি সিলেব্‌ল্‌ই রুদ্ধ, সুতরাং ইচ্ছে করলেও ওখানে অতিরিক্ত কোনও সিলেব্‌ল্‌ ঢোকানো শক্ত হত। 'ছাইভস্ম'-পর্বটি সম্পর্কে কিন্তু সে-কথা খাটে না। ওখানে আছে দুটি রুদ্ধ ও একটি মুক্ত সিলেব্‌ল্‌ (ছাই+ভস্‌+স)। সুতরাং আর-একটি সিলেব্‌ল্‌ ওখানে ঢোকানো যেত। কিন্তু তা না-ঢোকানো সত্ত্বেও যে ছন্দ বেচাল হয়নি, এটুকু অবশ্যই লক্ষণীয়।

কেন হয় না ? সিলেব্‌ল্‌-এর সংখ্যা চারের জায়গায় বেড়ে গিয়ে পাঁচ, কিংবা কমে গিয়ে তিন, হওয়া সত্ত্বেও কী করে ছন্দের চাল ঠিক থাকে ?

ব্যাপারটার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ছান্দসিকেরা বলেন, চাল নষ্ট হয় না আমাদের উচ্চারণের গুণে। (বললুম 'গুণ', কিন্তু ব্যাপারটা আসলে উচ্চারণের 'দোষ' ছাড়া আর কিছু নয়। তবে এ-ক্ষেত্রে সেটা দোষ হৈয়াও গুণ হচ্ছে বটে !) আমরা লিখি বটে 'কাঁপিয়ে পাখা', কিন্তু উচ্চারণে সেটা 'কাঁপ্‌য়ে পাখা' হয়ে দাঁড়ায়, 'তলিয়ে দেখলে' হয় 'তল্‌য়ে দেখলে'। ফলে সিলেব্‌ল্‌ও একটি করে কমে যায়। 'কাঁপিয়ে পাখা'য় যে-ক্ষেত্রে পাঁচটি সিলেব্‌ল্‌ পাচ্ছি (কাঁ + পি + য়ে পা + খা), 'কাঁপ্‌য়ে পাখা'য় সে-ক্ষেত্রে চারটি সিলেব্‌ল্‌ মিলবে (কাঁপ্‌ + য়ে পা + খা)। 'তলিয়ে দেখলে' যে-ক্ষেত্রে পাঁচটি সিলেব্‌ল্‌ দিয়ে গড়া (ত + লি + য়ে দেখ্‌ + লে), 'তল্‌য়ে দেখলে'র সিলেব্‌ল্‌-সংখ্যা সে-ক্ষেত্রে চারের বেশি নয় (তল্‌ + য়ে দেখ্‌ + লে)।

কিন্তু 'যমুনাবতী'র ব্যাখ্যা কী ? ছান্দসিকেরা এ-ক্ষেত্রেও সম্ভবত বলবেন যে, তাড়াতাড়ি বলবার সময় আমরা 'যমুনাবতী' বলি না, বলি 'যোম্‌নাবতী' ; ফলে সিলেব্‌ল্‌-এর সংখ্যা এ-ক্ষেত্রেও চারে এসে দাঁড়ায় (যোম্‌ + না + ব + তী)। এই নিয়ম অনুযায়ী 'মরে যেন সে' আর 'পূজাবাটীতে'র ক্ষেত্রেও সিলেব্‌ল্‌-এর সংখ্যা কমে গিয়ে চারে এসে দাঁড়াবার একটা-কিছু ব্যাখ্যা নিশ্চয় মিলবে।

ব্যাখ্যা মেলে সিলেব্‌ল্‌-এর সংখ্যা যেখানে চারের কম, সেখানেও। ছান্দসিক বলবেন, তিন সিলেব্‌ল্‌কেই আমরা সেখানে টেনে উচ্চারণ করে চারে এনে দাঁড় করাই। 'আজ রামের/অধিবাস/কাল রামের/বিয়ে' এই লাইনটিকে টেনে বলি 'আ-জ রামের/অধি-বাস/কা-ল রামের/বিয়ে'। 'গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে'র ক্ষেত্রে প্রথম পর্বটিতে চারটি সিলেব্‌ল্‌ থাকায় টেনে পড়বার দরকার হয় না, কিন্তু দ্বিতীয় পর্বে আর তৃতীয় পর্বে সিলেব্‌ল্‌-এর ঘাটতি থাকায় টেনে পড়তে হয়। ঘাটতি মেটাবার জন্যে বলতে হয় 'ভা-ই আমার/ম-ন কেমন'।

সিলেব্‌ল্‌-এর সংখ্যা, আমরা আগেই আভাস দিয়েছি, তিনে নেমেই

সর্বদা ক্ষান্ত হয় না। মাঝে-মাঝে, নামবার ঝোঁকে, সে-দুয়ে গিয়েও নামে। প্রবোধচন্দ্র তাঁর 'ছন্দ-পরিক্রমা' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে তার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন :

"বাইরে কেবল/জলের শব্দ/ঝুপ ঝুপ/ঝুপ
দস্যি ছেলে/গল্প শোনে/একেবারে/চুপ।

এখানে দুটি লাইনেই আছে তিনটি করে পর্ব ও একটি করে ভাঙা পর্ব। প্রতি পর্বে আছে চারটি করে সিলেব্‌ল্। ব্যতিক্রম ঘটেছে শুধু প্রথম লাইনের তৃতীয় পর্বে। সিলেব্‌ল্-এর সংখ্যা সেখানে শুধু যে কমেছে তা নয়, কমে একেবারে দুয়ে এসে ঠেকেছে। ছন্দের চাল তবু যে নষ্ট হয়নি, তার ব্যাখ্যা কী? ব্যাখ্যা অবশ্যই এই যে, 'ঝুপ ঝুপ'কে এ-ক্ষেত্রে আমরা টেনে 'ঝুউপ ঝুউপ' করে উচ্চারণ করি ; ফলে চারের হিসেবটাও মিলে যায় (ঝু + উপ্ + ঝু + উপ্), ছন্দের চালও নষ্ট হয় না।

... ...

স্বরবৃত্ত ছন্দের নিয়ম কী, আমরা জেনেছি। নিয়মের ব্যতিক্রমের কথাও জানলুম। ব্যতিক্রম ঘটা সত্ত্বেও ছন্দের চাল কেন নষ্ট হয় না, সেই ব্যাখ্যাটাও পাওয়া গেল। ব্যাখ্যা যাঁরা দিয়েছেন, তাঁরা প্রবীণ ছান্দসিক। ছন্দ-শাস্ত্রে তাঁরা পারদ্রষ্টা। তাঁদের পাণ্ডিত্য প্রশ্নাতীত ; ধ্বনি ও উচ্চারণের হাড়হদ্দ তাঁরা জানেন। তাঁদের কথার প্রতিবাদ করব, এত বড় ধৃষ্টতা আমাদের নেই।

কিন্তু নিজেদের কথাটাকে জানাবার অধিকার নিশ্চয়ই আছে। আমাদের বক্তব্য আমরা এখানে পেশ করলুম।

(১) 'কাঁপিয়ে পাখা', 'তলিয়ে দেখলে', 'যমুনাবতী', 'মরে যেন সে', 'পূজাবাটীতে' জাতীয় পাঁচ-সিলেব্‌ল্-সংবলিত পর্বের ক্ষেত্রে উচ্চারণকে কিছুমাত্র বিকৃত কিংবা সংকুচিত না করে (অর্থাৎ প্রতিটি স্বরকেই যথাবিধি উচ্চারণ করে) দেখেছি, স্বরবৃত্তের চাল তাতেও নষ্ট হয় না। ঠিকই থাকে।

(২) তৎসত্ত্বেও যদি ছান্দসিকেরা বলেন যে, না, চাল ঠিক থাকে না, এবং ঠিক রাখবার জন্যেই উচ্চারণকে কোথাও (পর্বে যেখানে

সিলেব্‌ল্‌-এর সংখ্যা চারের বেশি) গুটিয়ে আনতে হবে, আবার কোথাও (পর্বে যেখানে সিলেব্‌ল্‌-এর সংখ্যা চারের কম) ছড়িয়ে দিতে হবে, এবং পর্বের দৈর্ঘ্যে এইভাবে সমতা বিধান করতে হবে, তা হলে আমরা বিনীতভাবে প্রশ্ন করব যে, উচ্চারণের এইভাবে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটাবার রীতি তো গানের ব্যাপারে চলে, ও-রীতি কি কবিতাতেও চলা উচিত ?

কথাটা যখন উঠলই, তখন আরও মূলে গিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়। জিজ্ঞেস করা যায়, স্বরবৃত্ত ছন্দে উচ্চারণকে প্রয়োজনবোধে কোথাও গুটিয়ে আনা এবং কোথাও ছড়িয়ে দেওয়া (এবং এইভাবে পর্বের দৈর্ঘ্যে সাম্যবিধান করা) যদি অত্যাবশ্যক হয়ই, তবে স্বরবৃত্তকে মূলত কবিতার ছন্দ বলে গণ্য করা চলে কি না।*

প্রশ্নটা অকারণ নয়। আমরা সকলেই জানি, সেকালের অনেক ছড়াই গানের সগোত্র। ঘুমপাড়ানি ছড়া তো বটেই। 'খোকা ঘুমোলো পাড়া জুড়োলো বর্গি এলো দেশে'—কোলের উপরে ছেলেকে শুইয়ে একালের জননীরাও যখন এই কথাগুলি উচ্চারণ করেন তখন অজান্তেই এই কথাগুলিতে কিছুটা সুরের দোলানি লেগে যায়। (প্রসঙ্গত বলি, 'খোকা ঘুমোলো' আর 'পাড়া জুড়োলো'তেও সিলেব্‌ল্‌-এর সংখ্যা চারের বেশি।) লাগে আরও অনেক ছড়াতেই। তখন মনে হয়, এই ছড়াগুলি আসলে কবিতা নয়, গান—যা সুর সহযোগে গেয়। কথার ভূমিকা সেখানে যৎসামান্য, সুরই সেখানে ছন্দ ঠিক রাখে। (সেই সুর হয়তো খুবই এলিমেন্টারি, কিন্তু তা সুরই।) আর তা-ই যদি হয়, ছড়ার কথাগুলিকে তবে কবিতার ছন্দের কড়া-ইস্ত্রি নিয়মকানুনের ফ্রেমে আঁটাবার চেষ্টা কি কিছুটা অর্থহীন হয়ে পড়ে না ? কাব্যছন্দের ব্যাকরণ দিয়ে তো গীতিকা-র শরীরকে আমরা বিশ্লেষণ করতে পারিনে।

ছান্দসিকেরা এ সম্পর্কে কী বলবেন, আমাদের জানা নেই। তবে স্বরবৃত্তের চালচলন দেখে সন্দেহ না-হয়েই পারে না যে, এই ছন্দ মূলত গানেরই ছন্দ, পরবর্তী কালে কবিতাতেও যার সার্থক ব্যবহার সম্ভব হয়েছে।

---

* 'পরিশিষ্ট' অংশে ডঃ ভবতোষ দত্তের চিঠি দ্রষ্টব্য।

সব ছন্দই কি সিলেবিক্

যা বলবার বলেছি। এখন, ছন্দের এই ব্যাপারটাকে আর-এক দিক থেকে দেখা যাক। তিন ছন্দের শারীরিক নির্মাণের উপরে নজর রেখে ভাবা যাক যে, এদের মাত্রা-বিচারের কোনও সামান্য কৌশল আছে কি না। সামান্য বলতে এখানে তুচ্ছ কিংবা নগণ্য বোঝানো হচ্ছে না। ইংরেজিতে যাকে বলে 'কমন্', সামান্য এখানে তা-ই। (দৃষ্টান্ত: ইংরেজদের মধ্যে কেউ রোগা, কেউ মোটা, কেউ ঢ্যাঙা, কেউ বেঁটে, কিন্তু এ-সব বৈসাদৃশ্য সত্ত্বেও তাদের যে একটা 'কমন্ ফ্যাকটর' বা 'সামান্য লক্ষণ' সকলের চোখে পড়ে, সেটা এই যে, তারা সবাই দিব্যি গৌরবরণ।) এবং 'সামান্য কৌশল' বলতেও আমরা সেই কৌশলকে বোঝাচ্ছি, তিনটি ছন্দের মাত্রা-বিচারেই যা প্রয়োগ করা যেতে পারে।

কিংবা 'সামান্য কৌশল' না-বলে আমবা 'মাস্টার কী'ও বলতে পারি। স্বর্গত দীনেন্দ্রকুমার রায় ইংরেজি এই 'মাস্টার কী'র ভারী সুন্দর একটি বাংলা করে দিয়েছিলেন। 'সবখোল্ চাবি'। কথা হচ্ছে, অক্ষরবৃত্ত মাত্রাবৃত্ত আর স্বরবৃত্ত, এই তিন তালাকেই যা খুলতে পারে, এমন কোনও সবখোল্ চাবির আশা কি নেহাতই দুরাশা?

মোটেই নয়। সবখোল্ সেই চাবি আমাদের সামনেই রয়েছে। একটু লক্ষ করলেই আমরা দেখতে পাব যে, স্রেফ সিলেব্‌ল্-এর চাবি ঘুরিয়েই আমরা তিন ছন্দের তালা খুলে তাদের মাত্রা-রহস্যের একেবারে মর্মস্থলে গিয়ে ঢুকতে পারি।

মাত্রার ব্যাপারে, শুধু স্বরবৃত্ত নয়, তিনটি ছন্দই আসলে সিলেব্‌ল্-এর উপরে নির্ভরশীল। এ-ক্ষেত্রে তারা পরস্পরের সগোত্র। অন্যদিকে, তাদের অমিলটা এইখানে যে, তাদের তিন জনের নির্ভরশীলতা তিন

রকমের। যথা, স্বরবৃত্তে যে-ক্ষেত্রে সিলেব্‌ল্ মাত্রেই অনধিক একটি মাত্রার মূল্য পেয়েই খুশি, মাত্রাবৃত্তে সে-ক্ষেত্রে মুক্ত সিলেব্‌ল্ এক-মাত্রার মূল্য পেলেও রুদ্ধ সিলেব্‌ল্ মূল্য পায় দু-মাত্রার। আবার অক্ষরবৃত্তেও (ঠিক ওই স্বরবৃত্ত আর মাত্রাবৃত্তেরই মতো) প্রতিটি মুক্ত সিলেব্‌ল্‌কে আমরা এক-মাত্রার মূল্য দিই বটে, কিন্তু রুদ্ধ সিলেব্‌ল্-এর ক্ষেত্রে আরও-একটু ব্যতিক্রম ঘটে যায়।

স্বরবৃত্তে কী মুক্ত, কী রুদ্ধ, কোনও সিলেব্‌ল্ই এক-মাত্রার বেশি মূল্য দাবি করে না; মাত্রাবৃত্তে সে-ক্ষেত্রে রুদ্ধ সিলেব্‌ল্ সর্বত্র দু-মাত্রা দাবি করে; আর অক্ষরবৃত্তে সে-ক্ষেত্রে রুদ্ধ সিলেব্‌ল্ কোথাও এক-মাত্রা দাবি করে, কোথাও দু-মাত্রা।

প্রশ্ন: অক্ষরবৃত্তে রুদ্ধ সিলেব্‌ল্ কোথায় এক মাত্রা দাবি করে এবং কোথায় তাকে দু-মাত্রার মূল্য দিতে হয়?

উত্তর: রুদ্ধ সিলেব্‌ল্ যে-ক্ষেত্রে শব্দের আদিতে কিংবা মধ্যে যুক্তাক্ষরের আশ্রয় নিয়ে নিজেকে প্রচ্ছন্ন করে রাখে, সে-ক্ষেত্রে সে এক-মাত্রার বেশি মূল্য দাবি করে না; কিন্তু যুক্তাক্ষরের আশ্রয় নিয়েও যে-ক্ষেত্রে সে শব্দের অন্তে অবস্থিত, কিংবা শব্দের আদিতে বা মধ্যে অবস্থিত হয়েও যে-ক্ষেত্রে সে যুক্তাক্ষরের আশ্রিত নয়, সে-ক্ষেত্রে সে দু-মাত্রার মূল্য চায়।

দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। 'উদ্বন্ধন' শব্দটি তিনটি রুদ্ধ সিলেব্‌ল্ দিয়ে গড়া। উদ্+বন্+ধন্। কিন্তু তাদের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় রুদ্ধ সিলেব্‌ল্ (উদ্, বন্) যেহেতু যুক্তাক্ষরের আশ্রিত, এবং যেহেতু তাদের প্রথমজনের (উদ্) অবস্থান শব্দের আদিতে ও দ্বিতীয়জনের (বন্) অবস্থান শব্দের মধ্যে, অতএব অক্ষরবৃত্তে তাদের কেউই একমাত্রার বেশি মূল্য চায় না। তৃতীয়জন (ধন্) সে-ক্ষেত্রে যুক্তাক্ষরের আশ্রিত হয়েও শব্দের অন্তে রয়েছে। ফলত অক্ষরবৃত্তে সে দু-মাত্রার মূল্য দাবি করবে। এবং সব মিলিয়ে 'উদ্বন্ধন' শব্দটি অক্ষরবৃত্তে পাবে চার মাত্রার মূল্য (১+১+২)।

যাই হোক, মাত্রা-বিচারের ব্যাপারে দেখা যাচ্ছে সব ছন্দেই

সিলেব্‌ল্‌-নামক ব্যাপারটার ভূমিকা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তাই বলেই কি ত্নম করে আমরা বলে বসব যে, সব ছন্দই আসলে সিলেবিক্‌? না, তা নিশ্চয় বলব না। শুধু বলব যে, সিলেবিক্‌ ছন্দে অর্থাৎ স্বরবৃত্তে তো সিলেব্‌ল্‌কে ভুলে থাকবার কথাই ওঠে না, উপরন্তু ছন্দটা যেখানে স্বরবৃত্ত নয়, সেখানেও সিলেব্‌ল্‌কে ভুলে থাকবার উপায় নেই।

পয়ার ও মহাপয়ার

ছন্দ নিয়ে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আলোচনার সময়ে লক্ষ করেছি, 'পয়ার' শব্দটিকে তাঁদের কেউ-কেউ খুব শিথিলভাবে প্রয়োগ করেন। বস্তুত, তাঁদের কাছে 'পয়ার' ও 'অক্ষরবৃত্ত' সমার্থক শব্দ ; যখন তাঁরা বলেন যে, অমুক কবির হাতে পয়ার খুব ভাল খোলে, তখন আসলে তাঁরা বলতে চান যে, সেই কবি অক্ষরবৃত্ত ছন্দের ব্যবহারে খুব দক্ষ। পয়ার ও অক্ষরবৃত্তে তাঁরা এইভাবে তালগোল পাকিয়ে ফেলেন কেন, সেটা বোঝা অবশ্য শক্ত নয়। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের আলোচনায় ইতিপূর্বে আমি বলেছি, "রবীন্দ্রনাথের আগে পর্যন্ত, এমন কী রবীন্দ্রকাব্যেরও সূচনাপর্বে, বাংলা কবিতা প্রধানত অক্ষরবৃত্তে লেখা হয়েছে।" এখন বলি, অক্ষরবৃত্তে রচিত সেইসব কবিতার একটি মস্ত বড় অংশই পয়ারবন্ধে বাঁধা। খুব সম্ভব তারই ফলে অক্ষরবৃত্ত বলতে অনেকে পয়ার বোঝেন, এবং পয়ার বলতে অক্ষরবৃত্ত। কিন্তু পয়ার বলতে সত্যিই কোনও ছন্দ বোঝায় না, পয়ার আসলে একটা বন্ধমাত্র (অর্থাৎ কবিতার পঙ্‌ক্তি-বিন্যাসের বিশেষ একটা পদ্ধতি), এবং সেই বন্ধে যেমন অক্ষরবৃত্ত, তেমনি মাত্রাবৃত্ত আর স্বরবৃত্তের পঙ্‌ক্তিকেও বাঁধা যেতে পারে। অনেকেই বেঁধেছেন।

কী সেই বন্ধের চেহারা? উত্তরটা সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত দিয়েছেন। তিনিও অবশ্য পয়ার বলতে আলাদা একটা ছন্দই বুঝতেন ("পয়ার জান না? তুমি যে ছন্দে লিখেছ একেই বলে পয়ার।"—'ছন্দসরস্বতী'), কিন্তু তা হোক, ওই যে তিনি পয়ারের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখছেন "আট-ছয় আট-ছয় পয়ারের ছাঁদ কয়", ওইটেই হচ্ছে পয়ার-বন্ধের সঠিক বর্ণনা। আট-ছয় বলতে এখানে আট-ছয় মাত্রার বিন্যাস বুঝতে হবে। অর্থাৎ যে-সব পঙ্‌ক্তি আমাদের পড়বার ঝোঁক অনুযায়ী দুটি অংশে বিভক্ত

হয়ে যায় ('অংশ' না-বলে 'পদ' বলাই রীতিসম্মত, কিন্তু পড়ুয়াদের বোঝাবার সুবিধার জন্য আপাতত আমি 'অংশ' বলাই শ্রেয় মনে করছি, পদ-এর প্রসঙ্গ এর পরের পরিচ্ছেদে আসছে), এবং যার প্রথমাংশে পাওয়া যায় আটটি মাত্রা ও দ্বিতীয়াংশে ছটি, তাদেরই আমরা বলি পয়ার-বন্ধে বাঁধা পঙ্‌ক্তি। এখন এই অংশভাগের কথাটা আর-একটু পরিষ্কার করে বলা দরকার। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি যে, পাঠকের দম নেবার সুবিধের জন্যে পঙ্‌ক্তির শেষে একটা ভাঙা-পর্ব রাখা হয়, এবং সেই ভাঙা-পর্ব অনেক সময় দু-মাত্রার হয়। অক্ষরবৃত্ত ছন্দ নিয়ে আলোচনার সময় আমি এও বলেছিলুম যে, কবিতার "লাইনটাকে যখন একসঙ্গে দেখি, তখন গোটা লাইনের বিন্যাসের মধ্যে ওই বাড়তি মাত্রা দুটি এমন চমৎকারভাবে নিজেদের ঢেকে রাখে যে, ওরা যে আলাদা, তা ঠিক ধরাও পড়ে না। বিশেষ করে ছয় কিংবা দশের বৃত্ত ছাড়িয়ে আমরা যখন চোদ্দ মাত্রায় গিয়ে পৌঁছই, অতিরিক্ত ওই দু-মাত্রাকে তখন ছন্দের মূল চালেরই অঙ্গ বলে মনে হয়।" অর্থাৎ চোদ্দ মাত্রার লাইনটা তখন আর ছোট মাপের বিচার অনুযায়ী ৪ + ৪ + ৪ + ২ থাকে না, বড় মাপের চালে সেটা ৮ + ৬ হয়ে ওঠে। এটা যেমন অক্ষরবৃত্তের পক্ষে সত্য, তেমনি ৪-মাত্রার মাত্রাবৃত্ত আর স্বরবৃত্তের পক্ষেও সত্য। যা ছিল ছোট-ছোট অংশের সমষ্টি, তা দুটি বড় মাপের অংশ হয়ে দাঁড়ায়। এই যে দুই-অংশে বিন্যস্ত পঙ্‌ক্তির আট-ছয় বন্ধ, একেই বলে পয়ার-বন্ধ। এই বন্ধে বাংলায় যেমন সেকালে ও একালে অক্ষরবৃত্তের কবিতা প্রচুর লেখা হয়েছে, তেমনি রবীন্দ্রনাথ নিজে ও তাঁর পরবর্তী কবিরা এই বন্ধে মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্তেও কম কবিতা লেখেননি।

আসুন, আমরা নিজেরাই এবারে এই বন্ধে দু-লাইন লিখে ফেলি।

নিম্নে আদিগন্ত শুধু/সমুদ্র সুনীল
ঊর্ধ্বাকাশে উড়ে যায়/দুটি গাংচিল

এ হল পয়ারে-বাঁধা অক্ষরবৃত্তের নমুনা। তেমনি

নীচে আদিগন্ত-যে/সিন্ধু সুনীল
ঊর্ধ্বে মেলেছে ডানা/দুটি গাংচিল

এ হল পয়ারে-বাঁধা মাত্রাবৃত্ত। ঠিক তেমনি

যোজন-যোজন নীলের খেলা/সমুদ্দুরের জলে
ঊর্ধ্বাকাশে শুভ্র দুটি/সারস উড়ে চলে

এ হল পয়ারে-বাঁধা স্বরবৃত্তের দৃষ্টান্ত। (ছন্দ ঠিক রেখে চটপট ছড়া বানাতে গিয়ে চিলকে সারস করে দিলুম, তার জন্যে চিলের কাছে তো বটেই, পড়ুয়াদের কাছেও ক্ষমা ভিক্ষা করি।) বলা বাহুল্য, যেহেতু ছন্দটা এখানে স্বরবৃত্ত, তাই সিলেব্‌ল্-এর হিসেবে এখানে মাত্রাসংখ্যা ধরতে হবে।

পয়ার-বন্ধের কথা তো বলা গেল, এবারে খুব সংক্ষেপে মহাপয়ারের কথা বলা যাক। মহাপয়ারের নামেই প্রমাণ, ওটি আর-কিছু নয়, পয়ারেরই একটা বড় সংস্করণ। পয়ার যে-ক্ষেত্রে আট-ছয়ের বন্ধ, মহা-পয়ার সে-ক্ষেত্রে আট-দশের। অর্থাৎ মহাপয়ারের বেলায় পঙ্‌ক্তির প্রথমাংশে—পয়ারের মতোই—আট মাত্রা থাকে, কিন্তু দ্বিতীয়াংশ আরও বড় চালে দশমাত্রায় ছড়িয়ে যায়। দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝানো যাক। পয়ারের বেলায় যে দৃষ্টান্ত দিয়েছি, তারই বক্তব্যকে এখানে আমরা মহাপয়ারে বাঁধব।

নিম্নে সারাদিন দেখি/আদিগন্ত সমুদ্র সুনীল
ঊর্ধ্বে শ্বেতবিন্দুসম/উড়ে যায় দুটি গাংচিল

এ হল মহাপয়ারে-বাঁধা অক্ষরবৃত্তের নমুনা। আবার

নীচে আদিগন্ত-যে/চঞ্চল সিন্ধু সুনীল
ঊর্ধ্বে মেলেছে ডানা/সুন্দর দুটি গাংচিল

এ হল মহাপয়ারে-বাঁধা মাত্রাবৃত্ত। আবার

যোজন-যোজন দেখছি শুধু/নীলের খেলা সমুদ্দুরের জলে
ঊর্ধ্বাকাশে পাল্লা দিয়ে/শুভ্র দুটি সারস উড়ে চলে

এ হল মহাপয়ারে-বাঁধা স্বরবৃত্তের দৃষ্টান্ত। (হায় চিল, ছন্দের খাতিরে আবার তোমাকে সারস বানালুম!)

পয়ার-মহাপয়ার প্রসঙ্গ এখানেই শেষ হল। এর পরে আসছে পদ, যতি ও যতিলোপের কথা।

পদ, যতি ও যতিলোপ

এবারে আমরা পদ-প্রসঙ্গে ঢুকব। পদ কারে কয়? পয়ার নিয়ে আলোচনার সময়ে তার কিছুটা আভাস দিয়েছিলুম। এবারে আর-একটু বিস্তারিতভাবে তার সুলুক-সন্ধান নেওয়া দরকার।

সনেট তো চোদ্দ পঙ্‌ক্তির কবিতা। বাংলায় তাকে আমরা চতুর্দশ-পদী কবিতা বলি। সেই বিচারে 'পদ' কথাটার অর্থ দাঁড়ায় পঙ্‌ক্তি। শব্দকোষেও, অন্যান্য অর্থের সঙ্গে, এই অর্থটা দেওয়া আছে বটে। কিন্তু এখানে আমরা 'পদ' বলতে যা বোঝাতে চাইছি, তাতে এই অর্থটা পরিত্যাজ্য। কেননা, একটু বাদেই আমরা দেখব যে, কবিতার পঙ্‌ক্তিতে অনেক সময় একাধিক পদ থাকে। সে-ক্ষেত্রে, 'পদ' বলতে যদি আমরা 'পঙ্‌ক্তি' বুঝি, তা হলে 'দ্বিপদী পঙ্‌ক্তি' কথাটার অর্থ দাঁড়াবে 'দ্বিপঙ্‌ক্তিক পঙ্‌ক্তি', এবং ব্যাপারটা তখন খুবই ধোঁয়াটে হয়ে দাঁড়াবে।

তার চেয়ে বরং 'পদ' বলতে 'পদক্ষেপ' বোঝা-ই ভাল। বস্তুত, প্রতি পদক্ষেপে যেখানে বিপদের আশঙ্কা কিংবা আনন্দের আশ্বাস রয়েছে, সেখানে তো আমরা 'পদে-পদে বিপদ' কিংবা 'পদে-পদে আনন্দ'-এর কথাই বলে থাকি। (উদাহরণ : "নিবিড় ব্যথার সাথে পদে-পদে পরম সুন্দর"—রবীন্দ্রনাথ।)

এখন ব্যাপার হচ্ছে এই যে, কবিতার পঙ্‌ক্তিগুলিকে তো আমরা একটানা পড়ে যাই না, একটু লক্ষ করলেই দেখতে পাব, আমরা যখন কবিতা পড়ি, তখন সেই কবিতার এক-একটি পঙ্‌ক্তি একাধিক অংশে বিভক্ত হয়ে যায়। এটা হয় ছন্দের চালের জন্য। তা যেমন অক্ষরবৃত্ত ছন্দ, তেমনি পয়ার-বন্ধের আলোচনার সময়ে আমরা দু-রকম চালের কথা জেনেছিলুম। ছোট-মাপের চাল আর বড়-মাপের চাল। চাল না-বলে

একে চলন কিংবা পদক্ষেপও বলতে পারি। সত্যি, এ যেন দু-রকমের পদক্ষেপ। ছোট-মাপের ও বড়-মাপের। এই দুই-মাপের পদক্ষেপ, আসলে, কবিতার পঙ্‌ক্তির ভিতরকার দুই-মাপের দুটি অংশকে আলাদা করে চিনিয়ে দেয়। আমরা যখন ছোট-পদক্ষেপে চলি, তখন ছোট-মাপের অংশটাকে ধরতে পারি। আর বড়-পদক্ষেপে চললে সন্ধান পাই বড়-মাপের অংশের। ছোট-মাপের অংশকে আমরা বলি 'পর্ব'। বড়-মাপের অংশকে বলি 'পদ'।

পদক্ষেপ-এর কথাটা যখন বলেইছি, তখন আর-একটু বিশদ করে বলা যাক। পদক্ষেপ করতে-করতে এগোনো মানে বারবার পা-ফেলা ও পা-তোলা। এই পা-ফেলা ও পা-তোলার মধ্যে একটু বিরতি ঘটে। এ যেন চলার মধ্যেই একটু থেমে-থাকার ব্যাপার। আমরা যখন কবিতা পড়ি, তখন একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর, প্রায় আমাদের অগোচরে এই থেমে-থাকার ব্যাপারটা ঘটতে থাকে। আমরা একটু চলি, একটু থামি, একটু চলি, একটু থামি—এই রকমের ব্যাপার আর কী। কবিতায় এই থেমে-থাকার ব্যাপারটাকেই বলে 'যতি'।

'যতি' আছে তিন রকমের। ছোট যতি, মাঝারি যতি আর বড় যতি। ছান্দসিক এর নাম দিয়েছেন লঘুযতি, অর্ধযতি আর পূর্ণযতি। কবিতার পঙ্‌ক্তির মধ্যে পর্ব যেহেতু সবচেয়ে ছোট অংশ, তাই তার পরে আসে লঘুযতি ; আর পদের মাপ যেহেতু পর্বের চেয়ে বড়, তাই তার পরে আসে অর্ধযতি। পঙ্‌ক্তির মাপ আরও বড়। তাই পূর্ণযতি আসে পঙ্‌ক্তির শেষে।

একটা দৃষ্টান্ত দিই।

নতমুখে বলেছিলে, চিত্তে রেখো আশা,
আঁধারেও দীপ্তি যেন পায় ভালবাসা।

এই যে অক্ষরবৃত্ত-ছন্দে-লেখা দুটি পংক্তি, ছোট-পদক্ষেপ চললে—ছন্দের চাল অনুযায়ী—এরা পর্বে-পর্বে এইভাবে ভাগ হয়ে যাবে :

নতমুখে/বলেছিলে,/চিত্তে রেখো/আশা,
আঁধারেও/দীপ্তি যেন/পায় ভাল/বাসা।

সে-ক্ষেত্রে প্রতি পর্বের শেষে আমরা একটুক্ষণের জন্য থেমে দাঁড়াব, এবং এই যে একটুক্ষণের জন্য থেমে দাঁড়ানো, এটাই হচ্ছে লঘুযতি।

বড়-পদক্ষেপে চললে কিন্তু পর্বে-পর্বে বিভক্ত না-হয়ে এই পঙ্‌ক্তি দুটি আর-একটু বড়-মাপে অর্থাৎ পদে-পদে ভাগ হয়ে যাবে। তখন ভাগটা হবে এইরকম :

নতমুখে বলেছিলে,/চিত্তে রেখো আশা,
আঁধারেও দীপ্তি যেন/পায় ভালবাসা।

তখন দেখতে পাব যে, দুটি পঙ্‌ক্তির প্রত্যেকটির মধ্যেই রয়েছে দুটি করে পদ ; অর্থাৎ এই পংক্তি দুটি হচ্ছে দ্বিপদী পঙ্‌ক্তি। (প্রথম পদ আট মাত্রার ; দ্বিতীয় পদ ছ মাত্রার।) সেই সঙ্গে আর-একটা জিনিসও দেখা যাবে। সেটা এই যে, ছোট-পদক্ষেপে চললে পর্বশেষে আমরা যেটুকু সময়ের জন্যে থেমে দাঁড়াচ্ছিলুম, বড়-পদক্ষেপে চলার ফলে পদশেষে তার চাইতে আর-একটু বেশি সময়ের জন্যে আমাদের থামতে হচ্ছে। আর দ্বিতীয় পদের সঙ্গে-সঙ্গে এ-ক্ষেত্রে যেহেতু পঙ্‌ক্তির সীমানাও শেষ হয়ে যাচ্ছে, তাই সেখানে থামতে হচ্ছে আরও-একটু বেশি সময়ের জন্যে। পদশেষে আর পঙ্‌ক্তিশেষে এই যে থেমে দাঁড়ানো, যথাক্রমে এরাই হচ্ছে অর্ধযতি আর পূর্ণযতি।

অক্ষরবৃত্তের বদলে এবারে দ্বিপদী এই পঙ্‌ক্তি দুটিকে আমরা মাত্রাবৃত্তে ঢালাই করব। যদি ৬-মাত্রার মাত্রাবৃত্তে ঢালাই করি, তা হলে এদের চেহারা দাঁড়াবে এই রকম :

নতমুখে তুমি বলেছিলে যেন চিত্তে খানিক আশা
জেগে থাকে আর আঁধারেও যেন জ্বলে ওঠে ভালবাসা।

এ-দুটিও দ্বিপদী পঙ্‌ক্তি। পদে-পদে ভাগ করলে ব্যাপারটা এই-রকম দাঁড়াবে :

নতমুখে তুমি বলেছিলে যেন/চিত্তে খানিক আশা
জেগে থাকে আব আঁধাবেও যেন/জ্বলে ওঠে ভালবাসা।

পঙ্‌ক্তি দুটিকে আমরা স্বরবৃত্তেও ঢালাই করতে পারি। লিখতে পারি :

শান্ত গলায় বলেছিলে, চিত্তে রাখো আশা,
অন্ধকারের বুকে জ্বালাও গভীর ভালবাসা।

এও দ্বিপদী পঙ্‌ক্তি। এর পদবিভক্তি হবে এই রকম :

শান্ত গলায় বলেছিলে/চিত্তে রাখো আশা,
অন্ধকারের বুকে জ্বালাও/গভীর ভালবাসা।

এবারে ত্রিপদী পঙ্‌ক্তির দৃষ্টান্ত দিই :

অবশ্যই তার চেয়ে আছে আরও ভাল মেয়ে, কিন্তু হে ঘটক,
আগে তারই কথা কও, অন্যথা বিদায় হও, সম্মুখে ফটক।

এর পদ-বিভাজন হবে এই রকম :

অবশ্যই তার চেয়ে/আছে আরও ভাল মেয়ে,/কিন্তু হে ঘটক,
আগে তারই কথা কও,/অন্যথা বিদায় হও,/সম্মুখে ফটক।

শব্দগুলিকে, ছন্দের চাল অনুযায়ী, এখানে দুই পঙ্‌ক্তিতে সাজানো হয়েছে। আগেকার দিন হলে অবশ্য অন্য-বিন্যাসে এদের সাজানো হত। বিন্যাসটা হত এই রকম :

অবশ্যই তার চেয়ে   আছে আরও ভাল মেয়ে
          কিন্তু হে ঘটক,
আগে তারই কথা কও,   অন্যথা বিদায় হও,
          সম্মুখে ফটক।

বলা বাহুল্য, ঘটক-মহাশয়ের প্রতি নিবেদিত এই শব্দাবলীকে এখানে অক্ষরবৃত্ত ছন্দে ধরা হয়েছে। সে-ক্ষেত্রে, মাত্রাবৃত্ত কিংবা স্বরবৃত্তেও একে বিন্যস্ত করা যেত। কিন্তু আমরা তো এখানে ছন্দের পার্থক্য বুঝতে বসিনি, পদ-পরিচয়টাই শুধু পেতে চাইছি। আশা করি, সেই পরিচয় ইতিমধ্যে স্পষ্ট হয়েছে।

এবারে একটু যতির কথায় ফিরব। যতির পরিচয় আমরা আগেই পেয়েছি। কিন্তু একটা জরুরি কথা তখন জানা হয়নি। সেটা এই যে, লঘুযতি ও অর্ধযতি মাঝে-মাঝে লোপ পেয়ে যায়। অর্থাৎ পর্ব কিংবা পদের শেষে তখন আর থেমে দাঁড়াবার উপায় থাকে না। পুরনো সেই উদাহরণটির উপরে আর-একবার চোখ রাখা যাক :

নতমুখে বলেছিলে, চিত্তে রেখো আশা,
আঁধারেও দীপ্তি যেন পায় ভালবাসা।

পর্বের হিসেব করলে দেখা যাবে যে, অক্ষরবৃত্তে-লেখা এই পঙ্‌ক্তি দুটির প্রতিটিতে আছে তিনটি করে পর্ব ও একটি করে ভাঙা-পর্ব। আবার, পদের হিসেব নিলে দেখতে পাব যে, এই পঙ্‌ক্তি দুটির প্রতিটিতে আছে দুটি করে পদ। এখন কথা হচ্ছে, পর্ব ও পদের সীমানা এখানে এতই স্পষ্ট যে, পর্বশেষের লঘুযতি ও পদশেষের অর্ধযতির ব্যাপারটাকে বুঝে নিতে এ-ক্ষেত্রে আমাদের কিচ্ছু অসুবিধে হয়নি। কিন্তু আমরা যখন কবিতা লিখি, তখন পর্ব ও পদের সীমানা কি সর্বত্র এমন স্পষ্টভাবে টেনে দেওয়া যায়? যায় না। (পর্বের সীমানা তো মাঝে-মাঝেই অস্পষ্ট থেকে যায়।) কেন? কারণটা আর কিছুই নয়, পর্ব অথবা পদের সঙ্গে শব্দের বিরোধ। পর্ব অথবা পদের সীমানা শেষ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও যখন শব্দের সীমানা শেষ হয় না, তখন অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় যে, (শব্দটাকে না-ভেঙে) গোটা শব্দটাকে একসঙ্গে উচ্চারণ করবার প্রয়োজনে আমরা পর্ব অথবা পদের শেষে থেমে দাঁড়াতে পারছি না। আর তখনই আমরা বুঝতে পারি যে, লঘুযতি ও অর্ধযতি এ-ক্ষেত্রে লোপ পেয়ে গেল।

আগের উদাহরণের সামান্য কিছু পরিবর্তন ঘটিয়ে এবারে নতুন করে সাজিয়ে নেওয়া যাক। লেখা যাক :

অস্ফুট বলেছ, যেন চিত্তে থাকে আশা,
আঁধারে অম্লান যেন জ্বলে ভালবাসা।

বলা বাহুল্য, এইভাবে লিখলেও পঙ্‌ক্তি দুটির ছন্দ একই থাকবে, কিন্তু দুটি পঙ্‌ক্তির কোনওটিরই প্রথম পর্বের সীমানাকে এ-ক্ষেত্রে আর স্পষ্ট করে দেখানো যাবে না। ফলে প্রথম পর্বের শেষে আর আমরা থেমে দাঁড়াতেও পারব না। পঙ্‌ক্তি দুটির পর্ব-বিভাজন এ-ক্ষেত্রে এইরকম হবে :

অস্ফুট ব : লেছ, যেন/চিত্তে থাকে/আশা,
আঁধারে অ : ম্লান যেন/জ্বলে ভাল/বাসা।

পর্বশেষের লঘুযতি কী ভাবে লোপ পায় আমরা তা দেখলুম।

এতে ছন্দের কোনও হানি হয় না, বরং তার বিন্যাসে বেশ একটা বৈচিত্র্যের ছোঁয়া লাগে।

পর্বান্তিক লঘুযতির মতো পদান্তিক অর্ধযতিও অনেকক্ষেত্রে লোপ পায়। কী ভাবে পায়, আগের ওই উদাহরণটিকেই আরও-একটু ঘুরিয়ে সাজালে সেটা বোঝা যাবে। যেমন, ধরা যাক, আমরা যদি লিখি :

নতমুখে বলেছ, হৃদয়ে রাখো আশা,
আঁধারেও অম্লান জ্বলুক ভালবাসা।

তা হলে এই পঙ্‌ক্তি দুটির প্রথম পদ ও দ্বিতীয় পদের মধ্যবর্তী সীমারেখা স্পষ্ট হয়ে ফুটবে কি ? ফুটবে না। পদ-বিভাজন সে-ক্ষেত্রে এইরকম হবে :

নতমুখে বলেছ, হৃ : দয়ে রাখো আশা,
আঁধারেও অম্লান জ্ব : লুক ভালবাসা।

অর্থাৎ প্রথম পঙ্‌ক্তির 'হৃদয়ে' ও দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির 'জ্বলুক' শব্দকে না-ভেঙে আমরা একটানা উচ্চারণ করতে চাইব (কেননা, সেটাই স্বাভাবিক উচ্চারণ), এবং তারই ফলে, প্রথম ও দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির প্রথম পদের শেষে আমরা থেমে দাঁড়াতে পারব না। তখন আমরা বুঝে নেব যে, পদান্তিক অর্ধযতি এ-ক্ষেত্রে লোপ পেয়ে গেল।

কিন্তু লঘুযতির বিলোপ যদিও পঙ্‌ক্তি-বিন্যাসের কোনও ক্ষতি করে না, অর্ধযতির বিলোপ তাকে বেশ-খানিকটা ধাক্কা দেয়। কবিতার বিন্যাসে যাঁরা আদ্যন্ত মসৃণতার পক্ষপাতী, তাঁদের পক্ষে তাই অর্ধযতিকে যথাসম্ভব বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করাই ভাল।

প্রসঙ্গত, একটা কথা বলি। লঘুযতি ও অর্ধযতি কীভাবে লোপ পায়, সেটা বোঝাবার জন্য আমরা এখানে যে-সব উদাহরণের সাহায্য নিয়েছি, সেগুলি অক্ষরবৃত্তে লেখা। সে-ক্ষেত্রে মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্তে লেখা পঙ্‌ক্তির সাহায্যেও যতিলোপের ব্যাপারটা অবশ্যই বুঝিয়ে বলা যেত। কিন্তু তার আর কোনও দরকার আছে কি ? নেই নিশ্চয় ?

কবিতার ক্লাসে তা হলে এখানেই আমি ছুটির ঘণ্টা বাজিয়ে দিলুম। এবারে পড়ুয়াদের মধ্যে উপাধিপত্র বিতরণের পালা। এই উপলক্ষে আমি পদ্যে একটি ভাষণ দিতে চাই।

উপাধি-বিতরণ উপলক্ষে কবিকঙ্কণের ভাষণ

কবিতার ক্লাস অদ্য হৈল সমাপন,
কিছু উপদেশ দিব, শুন ছাত্রগণ।
বহুবিধ কর্ম আছে জগৎ-সংসারে,
তেমতি কর্মীও আছে হাজারে-হাজারে।
কেহ তেজারতি করে, কেহ-বা মোক্তারি,
কেহ-বা দালালি করে, কেহ ঠিকাদারি।
কেহ-বা সাজায় যত্নে ইষ্টকের পাঁজা,
কেহ-বা পিষ্টক গড়ে, কেহ তেলেভাজা।
কেহ-বা পড়ায় ছাত্র, বিদ্যালয়ে যায়,
রাস্তার উপরে কেহ বান্দর নাচায়।
কেহ কৃষিকর্ম করে, কেহ ধান ভানে,
কেহ-বা চালায় টেম্‌পো, কেহ রিকশা টানে।
পানের বোঁটাটি হস্তে, নাহি-ক সময়,
চলেছে দপ্তরে কেহ, ব্যস্ত অতিশয়।
কেহ-বা ডাক্তারি করে, বত্রিশ টাকার
ভিজিটে ছত্রিশ তলা বাড়ি ওঠে তার।
কেহ করে রাজনীতি, অন্যের মাথায়
কৌশলে কাঁঠাল ভেঙে কোয়াগুলি খায়।
কেহ তৈল বেচে, কেহ তেলা মস্তকের
উপরেই তৈল ঢেলে গুছায় আখের।
কেহ করে জনসেবা, ধন্য হয় দেশ ;

কেহ-বা কাজের মধ্যে উল্টায় গণেশ।
এইমতো নানা লোকে নানা কর্ম করে,
কর্মী নামে খ্যাত হয় বিশ্ব-চরাচরে।
কর্মযোগী কর্মবীর নানা আখ্যা পায়,
কর্মের জাঁতাটি তারা অক্লেশে ঘুরায়।
তেমতি কবিতা লেখা কর্ম যদি হয়,
কবিকেও লোকে কর্মী বলিত নিশ্চয়।
কিন্তু যে কবিতা লেখে,—শিশু বৃদ্ধ নারী
সকলেই বলে তাকে 'অকর্মার ধাড়ি'।
অশান্তিতে জ্বলে সদা কবির সংসার,
ভাই বন্ধু সকলেই নিন্দা করে তার।
মাতৃদেবী কান্দে তার, পিতৃদেব হাঁকে :
"এইবারে ত্যাজ্যপুত্র করিব ব্যাটাকে।"
জায়াও সর্বদা কয় মুখ করি কালো,
"ইহাপেক্ষা ডাকাতের হাতে পড়া ভালো।"
বাড়িওলা শোনে যদি, নূতন ভাড়াটে
পদ্য লেখে, তবে তার ভয়ে দিন কাটে।
ইদানীং মুদিরাও হয়েছে সেয়ানা,
কবিকে বাকিতে তারা কিচ্ছুই দেয় না।
অধিক কব কী, কোনো কাবুলিওলাও
কবিকে দেয় না কর্জ ; বলে, "ভাগ্ যাও।"
এই সব ভেবেচিন্তে ছাত্রগণ সবে
ঠিক করো, কবি কিংবা কর্মবীর হবে।
পিতার ধমক, মুদি যাদবের তাড়া,
বন্ধুদের ব্যঙ্গ, গৃহিণীর মুখনাড়া,
কোনোদিকে কিছুমাত্র দৃষ্টি নাহি হেনে,
সবকিছু 'ললাটস্থ লিখনং' জেনে
তবু পদ্য লিখিবার ইচ্ছা যদি হয়,

মাঝে-মাঝে তুই ছত্র লিখিবা নিশ্চয়।
নিত্যও লিখিতে পারো, তবে কথা এই,
যত কবি বঙ্গে, তত পাঠক তো নেই।
আর যদি পাঠকের না করো পরোয়া,
তা হলে উত্তম কথা, সে তো বারো পোয়া।
সকালে লিখিয়ো তবে, দুপুরে লিখিয়ো,
বিকালে লিখিয়ো, শুধু রাত্রে ঘুম দিয়ো।
লিখিবার অন্ধিসন্ধি জেনেছ সবাই,
কবিতার ক্লাসে, তাই চিন্তা আর নাই।
শিখেছ ছন্দের রীতি, বাক্যের কায়দা,
এইবারে তাহাতেই উঠিবে ফায়দা।
স্নাতক-উপাধি আমি দিলাম সকলে।
(জানি না কী ধুন্ধুমার হবে তার ফলে।)
কবিকঙ্কণের কথা শেষ হৈল, আর
কথা নাই কিছু, যাও, সকলে এবার
তত পদ্য লেখো বাছা, যত ইচ্ছা হয়,
শুধু এক অনুরোধ, রাখিবা নিশ্চয়।
দৈনিক কাগজে পদ্য নাহি যায় ছাপা
নিতান্ত সহজ কথা, মনে রেখো বাপা।
সুতরাং লেখো পদ্য হাজারে হাজারে,
কিন্তু তাহা পাঠিয়ো না 'আনন্দবাজারে'।

সংযোজন

গৈরিশ ছন্দ

গিরিশচন্দ্র যে-সব নাটক লিখেছিলেন, তার সবই যে ছন্দোবদ্ধ, তা নয়। যে-সমস্ত নাটক পৌরাণিক আখ্যানের ভিত্তিতে লেখা, কিংবা গোত্র-বিচারে যা রোমান্টিক, শুধু তারই সংলাপকে তিনি ছন্দে বেঁধেছিলেন। আবার, সেখানেও যে তাঁর সমস্ত চরিত্রের সংলাপ একই ছন্দে বাঁধা, তাও নয়। একাধিক রকমের ছন্দের দোলা সেখানে আমরা দেখতে পাই। তার মধ্যে যেটা প্রধান ছন্দ, তাকেই আমরা 'গৈরিশ ছন্দ' বলে থাকি। একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :

"অভেদ কোরো না। ভেদ, সতি!
জেনো মাতা,
ভাগীরথী-পার্বতী, অভেদ।
বামদেব বাম
ভাবিলে, মা, অন্তর শিহরে!
কুমার আবদ্ধ বুঝি ভৈরবী মায়ায়!
বাক্য ধরো, অনুরোধ রক্ষা করো, মাতঃ।
শিবরানি সদয়া না-হলে
রুষ্ট শিব তুষ্ট নাহি হবে…।"

গিরিশচন্দ্রের 'জনা' নাটক থেকে অগ্নির সংলাপের একটা অংশ এখানে তুলে দিলুম। যে-ছন্দে এই সংলাপ বাঁধা, তাকে একটা আলাদা রকমের ছন্দ বলে ভাবতে আমরা অভ্যস্ত হয়েছি। কী ছন্দ? না, গৈরিশ ছন্দ।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, গৈরিশ ছন্দ কি সত্যিই একটা আলাদা রকমের

ছন্দ ? তা কিন্তু নয়। পয়ার যেমন আলাদা কোনও ছন্দ নয়, ত্রিবিধ ছন্দের একটা বিশেষ-রকমের বাঁধন মাত্র, গৈরিশ ছন্দও আসলে তা-ই। মূল ছন্দ এখানে অক্ষরবৃত্ত বা মিশ্রকলাবৃত্ত। গিরিশচন্দ্র সেই মূল ছন্দকে একটা বিশেষ বাঁধনে বেঁধেছিলেন, এবং সেই বাঁধন বা বিন্যাসটাই গৈরিশ ছন্দ বলে প্রসিদ্ধি পেয়েছে।

লক্ষণীয় যে, অক্ষরবৃত্ত এখানে অমিল বা অমিত্রাক্ষর। পঙ্‌ক্তিশেষে মিল রাখবার ব্যবস্থা এখানে নেই। কিন্তু সেটাও কোনও নতুন ব্যাপার নয়। এমন কী, নাটক রচনার ক্ষেত্রেও নয়। এ-কথা এইজন্যে বলছি যে, মাইকেল মধুসূদনের 'পদ্মাবতী' নাটকের বেশ-কিছু সংলাপ ইতিপূর্বে এই অমিল অক্ষরবৃত্তেই রচিত হয়েছিল। নাটকের সংলাপে ব্যবহৃত ছন্দের ব্যাপারে গিরিশচন্দ্রকে, অন্তত সেই বিচারে, কোনও নতুন পথের স্রষ্টা আমরা বলতে পারি না। পথিকৃৎ এক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্র নন, মাইকেল।

তবে কি গিরিশচন্দ্র এ-ক্ষেত্রে মাইকেলের অনুসারী মাত্র ? না, তা নয়। মাইকেলের হাতে যার প্রবর্তনা, সেই অমিল অক্ষরবৃত্তের বিন্যাসে একটা মস্ত পরিবর্তন তিনি ঘটিয়ে দিয়েছিলেন। মাইকেলের সঙ্গে এ-ব্যাপারে তাঁর পার্থক্যটা এইখানে যে, গিরিশচন্দ্র তাঁর অক্ষরবৃত্তে-রচিত সংলাপের পঙ্‌ক্তিগুলিকে একই মাপের রাখেননি ; পঙ্‌ক্তি থেকে ভাঙা-পর্বকে ইচ্ছেমতো বাদ দিয়েছেন ; তা ছাড়া, যত্রতত্র যতির ব্যবস্থা না-করে এমনভাবে তাঁর যতিগুলিকে তিনি বিন্যস্ত করেছেন, যাতে সংলাপটাকে ঠিকমতো বলে যাবার ব্যাপারে কারও কোনও অসুবিধে না হয়। যতির এই স্বাভাবিক বিন্যাসের ফলে গিরিশচন্দ্রের নাট্য-সংলাপে যে একটা অবাধ গতির সঞ্চার হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই।

যা-ই হোক, আসল কথাটা হচ্ছে এই যে, আমরা যাকে গৈরিশ ছন্দ বলি, বস্তুত তাকে অমিল অক্ষরবৃত্তের গৈরিশ বিন্যাস বললেই ঠিক হয়। এই বিন্যাসই জানিয়ে দেয় যে, অক্ষরবৃত্তের ব্যবহারে গিরিশচন্দ্রের দক্ষতা ছিল উল্লেখযোগ্য। আবার, ওই 'জনা' নাটকেই বসন্তকে যখন আমরা বলতে শুনি :

"ওলো তোর নিত্যি নতুন ঢং,
বালাই বালাই, ছাই মুখে তোর, এ কী আবার রং!
এমন কথা বলবি যদি আর,
চলে যাব তোর সোহাগের মুখে দিয়ে ক্ষার…।"

তখন আমরা বুঝতে পারি যে, স্বরবৃত্ত বা দলবৃত্তের ব্যবহারেও তাঁর দক্ষতা কিছু কম ছিল না।

অবশ্য আমরা সবচেয়ে বিস্মিত হই তখন, যখন দেখি যে, কোনও রকমের কাব্য-ছন্দের দোলাই যার মধ্যে নেই, সাদামাটা গদ্যে রচিত সেই সংলাপের মধ্যেও অত্যন্ত কৌশলের সঙ্গে কিছু মিল তিনি ঢুকিয়ে দিয়েছেন। ওই 'জনা' নাটকেই বিদূষক যখন বলে, "হরি হে, তোমার দোহাই—শীঘ্র না চরণ পাই। ছুটো মোণ্ডা খেতে এসেছি ছু-দিন, খেয়ে যাই," তখন গোপন সেই মিলগুলি যে গদ্যের মধ্যেও খানিকটা দোলা লাগায়, এবং তাকে—অন্তত খানিকটা পরিমাণে—পদ্যের দিকে এগিয়ে দেয়, তাও স্বীকার্য। সত্যি বলতে কী, গদ্যে-পদ্যে এই যে মেলবন্ধন তিনি ঘটিয়েছিলেন, যার ছায়া অত্যন্ত আধুনিক কালের কবিতার শরীরেও আমরা দেখতে পাই, এরই তাৎপর্য হয়তো সবচেয়ে বেশি।

পরিশিষ্ট

'জিজ্ঞাসু পড়ুয়া'র চিঠি—১

রবিবার দুপুরবেলা। মফস্বলের শহরগুলিতে সকালবেলায় খবরের কাগজ পাবার উপায় নেই। শরীরটাও বিশেষ ভাল নেই। তাই শুয়ে শুয়ে খবরের কাগজের পাতা ওলটাতে ওলটাতে 'মোহনবাগানের অপরাজিত আখ্যা' চোখে পড়তেই শরীরটা চাঙ্গা হয়ে উঠল। খেলার খবর শেষ করেই আবার শরীর এলিয়ে দিলাম। আলস্যবশে পাতা ওলটাতে ওলটাতে চোখে পড়ল 'কবিতার ক্লাস'। আগেও চোখে পড়েছে। কিন্তু কোনও দিন ওই ক্লাসে পাঠ নিতে উৎসাহ হয়নি। আমাদের প্রধান অধ্যাপক মহাশয় বাংলা কবিতা পড়ান। তাঁর কাছে পাঠ নিতে নিতে কবিতার ক্লাসের প্রতি আমার কেমন একটা অ্যালার্জি হয়ে গেছে। তাঁর ক্লাসে পাঠ নিতে গেলেই গায়ে যেন জ্বর এসে যায়। তাই আনন্দ-বাজারের কবিতার ক্লাসের চৌকাঠ মাড়াবার ইচ্ছাও হয়নি কোনও দিন। কিন্তু আজকের অলস দুপুরে ওদিকে তাকাতেই চোখে পড়ে গেল কয়েকটি ছড়া। ছড়ার টানেই ঢুকে পড়লাম ক্লাসে। ভারী আশ্চর্য লাগল। এ তো কবিকঙ্কণের ক্লাস নয়, স্বয়ং ছন্দ-সরস্বতীর ক্লাস। মনে হল, কবি সত্যেন্দ্রনাথ যে ছন্দ-সরস্বতীর কাছে পাঠ নিয়েছিলেন, আমিও যেন তাঁর কাছেই পাঠ নিচ্ছি। এ হল কী? আমার ছন্দাতঙ্ক রোগটা সেরে গেল কী করে? এই রোগটার একটু ইতিহাস আছে। আমাদের অধ্যাপক মশাই নিজে কবি, তার উপরে গুরুতরভাবে ছন্দ-ভক্ত। আমি বলি, ছন্দের অন্ধভক্ত। তিনি যখন কবিতা পড়েন, তখন কবিতা পড়েন না। ছন্দ পড়েন, বোঝা ভার। পড়ানোও তথৈব চ। তাঁর বাইবেল হচ্ছে প্রবোধ সেনের 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ' বইখানি। আমি বলি বাইবেল

নয়, ছান্দোগ্য উপনিষদ্। তাঁর টিউটোরিয়াল ক্লাসের জ্বালায় বইটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হয়েছে। বইটার গুরুত্ব অস্বীকার করবার উপায় নেই। নাড়াচাড়া করবার পক্ষে রীতিমত গুরুভার। দুবহ বা দুঃসহ বললেই ঠিক হয়। তাঁর এই বইটা পড়বার চেষ্টা করতে গিয়ে ডি. এল. রায়ের একটি হাসির গান মনে পড়ে গেল। অমনি ওটাকে একটু বদলে নিয়ে দাঁড় করালাম এই চারটি লাইন :

প্রবোধচন্দ্র ছিলেন একটি
ছন্দশাস্ত্র-গ্রন্থকার ;
এমনি তিনি ছন্দতত্ত্বের
করতেন মর্ম ব্যক্ত—
দিনের মতো জিনিস হত
রাতের মতো অন্ধকার,
জলের মতো বিষয় হত
ইঁটের মতো শক্ত।

এতেও মনের ঝাল মিটল না। গ্রন্থকার-অন্ধকার মিলটাও জুতসই নয়। তাই প্রথম লাইনটাকে আরও বদলে দিলাম—

প্রবোধচন্দ্র ছিলেন একটি
অপখ্যাত ছন্দকার।

এবার অপখ্যাত আখ্যা দিয়ে মনের ঝালও মিটল, ছন্দকার-অন্ধকার মিলে কানও খুশি হল।

প্রবোধচন্দ্রের বইটার আরও একটা বিশেষত্ব আছে। এই বইতে রবীন্দ্রনাথের ও অন্যান্য কবিদের ভাল ভাল কবিতাকে ছন্দের ছুরি দিয়ে এমন কাটা-ছেড়া করা হয়েছে যে, এই বই পড়ার পরে কবিতার উপরেই অশ্রদ্ধা জন্মে যায়। কোন কোন বন্ধু এই বইটাকে বলেন কবিতার ডিসেকশান রুম বা পোস্ট্ মরটেম রুম। আমি বলি কসাই-খানা। ভাল ভাল কবিতার উপরে এরকম নৃশংস উৎপাত দেখে প্রবোধ সেন সম্বন্ধেই একটা ছড়া বানিয়েছি। কবিতা-ক্লাসের অন্যান্য পড়ুয়াদেরও যদি আমার মতো এ-বই পড়বার দুর্ভাগ্য হয়ে থাকে, তবে

আমার ছড়াটা শুনে তাঁরাও কিছু সান্ত্বনা পেতে পারেন। তাঁদের তৃপ্তির জন্য ছড়াটা নিবেদন করলাম :

পাকা ধানে মই দেন, ক্ষেত্র চষেন।
বাংলা কাব্যক্ষেতে তিনিই প্র-সেন।

বলা উচিত যে, ছড়া বানাবার কিছু অভ্যাস আমার ছিল। কিন্তু ছন্দের হিসেব রাখার বালাই ছিল না। কেননা, আমি মনে করি, ছন্দ গোনার বিষয় নয়, শোনার বিষয়। চোখে ছন্দ দেখা যায় না, কানে শুনতে হয়। কোন্ রচনাটার কী ছন্দ, কোন্ বৃত্ত, কয় পর্ব বা মাত্রা, এ-সব শুনলেই আমার আতঙ্ক উপস্থিত হয়। এই নিয়ে আমার ছন্দে-পাওয়া সহপাঠী কবি-বন্ধুর (সে আবার অধ্যাপক মহাশয়ের পেয়ারের ছাত্র) সঙ্গে প্রায়ই হাতাহাতি হবার উপক্রম হত। একদিন অবস্থা চরমে পৌঁছল। আমার ক্ষমাগুণে সেদিন শান্তি রক্ষা হয়েছিল। সে একখণ্ড কাগজে আমাকে শাসিয়ে একটি 'কবিতা' রচনা করে আমার দিকে ছুঁড়ে দিল। কবিতাটি এই :

ওরে হতভাগা হলধর পুতিতুণ্ড।
মুখটি খুলিলেই গুড়িয়ে দেব মুণ্ড।
ফের যদি তুই বানাতে চাস রে ছন্দ,
সব লেখা একদম করে দেব বন্ধ।

এই কবিতা পড়ে আমার শুধু দম বন্ধ হবার নয়, পেট ফাটবারও উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু কিছু না বলে ক্ষমা করতে হল। কবি-বন্ধুর কথা দিয়ে কথা রাখার সৎসাহস সম্বন্ধে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। সহপাঠী বন্ধুরা একবাক্যে বললেন, এই কবিতাটির ছন্দ নির্ভুল, মাত্রা-সংখ্যার হিসেব ঠিক আছে। কিন্তু আমার—

কান "তা শুনি গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিবা কহে—
'নহে, নহে, নহে'।"

কান ও জ্ঞানের বিবাদভঞ্জন করতে না পেরে তখন থেকেই ছড়া বানানো একদম বন্ধ করে দিলাম। বন্ধুবরও আমার এই সত্যনিষ্ঠা ও নৈতিক সাহসের তারিফ করেছিল। তার এই গুণগ্রাহিতার প্রশংসা

না করে পারিনি।

ছড়া বানানো বন্ধ করার আরও একটা কারণ ঘটেছে। অধ্যাপক মহাশয় একদিন ক্লাসে এসেই প্রবোধ সেনের আর-একখানি সদ্য-প্রকাশিত বই সকলের সামনে তুলে ধরলেন। তারপরে চলল প্রশস্তি-বচন। আমি মনে মনে ভাবলাম—'একা বামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব দোসর।'

বইটির নাম 'ছন্দ-পরিক্রমা'। প্রথমে মনে হল, 'ছন্দ-পরিশ্রমা'। অধ্যাপক মশায়ের নির্দেশে এই বইটাও নাড়াচাড়া করে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলতে হল 'ছন্দ-পণ্ডশ্রমা'। আমার মতো স্বভাব-কবিকে ছন্দ বোঝাবার সমস্ত চেষ্টাই পণ্ডশ্রম, একথা স্বীকার করতে লজ্জা নেই। বইটির প্রথমেই পরিভাষা, শেষেও তাই। পরিভাষার ইটপাটকেলে হোচট খেতে খেতে ক্ষতবিক্ষত হতে হয়। এগোনো আর হয় না। কোনো পরিভাষা কেন মানতে হবে বা কেন ছাড়তে হবে, তার যুক্তিজালে জড়িয়ে গিয়ে দিশেহারা হতে হয়। প্রবোধ সেনই এক সময়ে ছন্দের তিন রীতির নাম দিয়েছিলেন—অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত। আর তিনিই বার বার নাম-বদল করে চলেছেন। এই বই পড়তে গিয়ে ডি. এল. রায়ের আর-একটা হাসির গান মনে পড়ে গেল :

"ছেড়ে দিলাম পথটা
    বদলে গেল মতটা,
এমন অবস্থাতে পড়লে
    সবারই মত বদলায়।"

এই মত-বদল ও নাম-বদলের পালা কবে শেষ হবে কে জানে। ততদিন ছন্দ শেখার ও ছন্দ লেখার কাজটা মুলতুবিই থাক্ না। তা ছাড়া যেটুকু সহজাত ছন্দ-বোধ আমার ছিল, এই বই পড়ে তাও ঘুলিয়ে গেল। সুতরাং ছড়া বানাবার অভ্যাস ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আর উপায় কী?

এমন সময় কবিকঙ্কণের কবিতার ক্লাসে ঢুকে যেন দিব্যদৃষ্টি পেয়ে

গেলাম। ছন্দাতঙ্ক এলার্জি কেটে গেল। উৎসাহিত হয়ে আগের সপ্তাহের রবিবাসরীয় আনন্দবাজার খুঁজে-পেতে বার করলাম। সে-সপ্তাহের কবিতার ক্লাসেও পাঠ নেওয়া গেল। দুই ক্লাসের পাঠ নিয়েই ছন্দবোধের কুয়াশা যেন অনেকটা কেটে গেল। আরও পাঠ নেবার জন্য মনটা উৎসুক হয়ে উঠেছে। আশা হয়েছে, পাঠ নেওয়া শেষ হলে ছন্দে-পাওয়া কবিবন্ধুকে একবার দেখে নিতে পারব। আর প্রবোধচন্দ্রের অন্ধভক্ত অধ্যাপক মহাশয়কেও···। না, সেকথা থাক্। ইতিমধ্যে ভালো করে পাঠ নিয়ে রাখা দরকার। আর তা হাতে-কলমে হলেই ভালো। ভরসার কথা এই যে, অধ্যাপক সরখেল মহাশয়ের নাতি ও ভৃত্যটির ছড়া শুনে আমার সেই ছড়া বানাবার ছেড়ে-দেওয়া অভ্যাসটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। এখন কবিতার ক্লাসের মনোযোগী ছাত্রের মতো পাঠ নিতেও পারব, প্রশ্ন করতেও পারব। প্রশ্নগুলি বোকার মতো না হলেই হল।

অধ্যাপক সরখেলের দৃষ্টান্ত নিয়েই নূতন ছড়া বানিয়ে প্রশ্ন করব :

স্বর্ণপাত্র নয় ওটা উর্ধ্ব নীলাকাশে,
বিশ্বের আনন্দ নিয়ে পূর্ণচন্দ্র হাসে।

এটা কোন্ রীতির ছন্দ ? অক্ষরবৃত্তের ? ভুল করিনি তো ? এবার ছন্দের রীতিবদল করা যাক।

স্বর্ণপাত্র নব সুনীল আকাশে,
পূর্ণিমা-চাঁদ হোথা সুখভরে হাসে।

এটা মাত্রাবৃত্ত তো ? আমার কান তো তাই বলে। কর্ণধাররা কা বলেন, জানতে চাই। কান মলার ভয় যে একেবারেই নেই, তা বলতে পারি না। আবার রীতিবদল করা যাক :

সোনার থালা নয় গো ওটা
সুদূর নীলাকাশে,
বিশ্বপ্রাণে জাগিয়ে পুলক
পূর্ণিমা চাঁদ হাসে।

এটাকে স্বরবৃত্ত ছন্দ বলা যায় কি ? আমার কান তো তাই বলে।

জ্ঞানের বিচারে কানের দণ্ডবিধান না হলেই বাঁচি। জ্ঞানের এজলাসে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়ালে প্রাণটাও ভয়ে কাঠ হয়ে যায়। হাকিমের রায় শুনে কানও অনেক সময় লাল হয়ে ওঠে। তবু অধ্যাপক সরখেল মহাশয়ের পরীক্ষার হলে হাজির হয়েছি। যদি তাঁর কাছে পাস-মার্কা পেয়ে যাই, তা হলে ছন্দে-পাওয়া কবিবন্ধু ও প্রসেন-ভক্ত ছন্দ-অধ্যাপককে···। না, এখনও সে-কথা বলবার সময় হয়নি। আগে তো কবিতার ক্লাসে রীতিমত পাঠ নিতে হবে, প্রশ্নও করতে হবে সন্দেহ দূর করবার জন্য।

এবার মনের দুঃখে নিজের দুরবস্থার কথা ফলাও করে বলতে হল। ভবিষ্যতে সরখেল মহাশয়ের বিরক্তি ঘটাব না। সংক্ষেপেই প্রশ্ন করব।

কবিকঙ্কণের উত্তর

নাম যদিও জানা গেল না, তবু আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, 'জিজ্ঞাসু পড়ুয়া' একজন পাকা ছান্দসিক। আমার ধারণা ছিল নেহাতই পাঠশালা খুলেছি, প্রথম পড়ুয়ারা যাতে ছন্দের ব্যাপারটাকে মোটামুটি ধরতে পারেন তার জন্যে সহজ করে সব বুঝিয়ে বলব, জটিলতার পথে আদৌ পা বাড়াব না। বাড়াবার সাধ্যও আমার নেই। একজন পাকা ছান্দসিক যে হঠাৎ সেই পাঠশালায় ঢুকে, পড়ুয়ার ছদ্মবেশে, পাটির উপরে বসে পড়বেন, এমন কথা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। তাঁর পদার্পণে আমি কৃতার্থ; কিন্তু ক্লাস নেওয়ার কাজটা এবারে আরও কঠিন হয়ে উঠল।

'জিজ্ঞাসু পড়ুয়া' কিছু প্রশ্ন করেছেন। তাঁর প্রশ্নের উত্তর আমি এখুনি দিচ্ছিনে। ভাবছি, গোলমেলে কেস হাতে এলেই ছোট ডাক্তাররা যেমন বড় ডাক্তারের সঙ্গে কনসাল্ট করেন, তেমনি আমাকেও হয় তো বড় ডাক্তারের শরণ নিতে হবে। এ-ব্যাপারে আমি যাঁকে সেরা ডাক্তার বলে মানি, তিনি কলকাতায় থাকেন না। উত্তর পেতে তাই হয়তো দেরি হবে।

ইতিমধ্যে একটা কথা অকপটে নিবেদন করি। সেটা এই যে, 'জিজ্ঞাসু পড়ুয়া' যদিও আমার দারুণ প্রশংসা করেছেন, তবু আমি খুশি হতে পারছিনে। খুশি হতে পারতুম, যদি তাঁর চিঠিতে শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন সম্পর্কে কোনও বক্রোক্তি না থাকত। জিজ্ঞাসু পড়ুয়া জেনে রাখুন, শ্রীযুক্ত সেন আমার গুরুস্থানীয় ছান্দসিক। ছন্দের শেষ কথাগুলি আমার জানা নেই। প্রথম কথাগুলি যদি জেনে থাকি, তবে শ্রীযুক্ত সেনের কাছ থেকেই জেনেছি। পরে আরও দু-একজন প্রখ্যাত ছান্দসিকের কাছে পরোক্ষে পাঠ নিয়েছি ঠিকই, কিন্তু শ্রীযুক্ত সেনের কাছে আমার ঋণের পরিমাণ তাতে লাঘব হয় না। এই স্বীকৃতির প্রয়োজন ছিল। 'জিজ্ঞাসু পড়ুয়া' যদি এর ফলে আমার উপরেও চটে যান, তো আমি নিরুপায়।

'জিজ্ঞাসু পড়ুয়া'র চিঠি—২

শ্রীকবিকঙ্কণ সমীপে

সশ্রদ্ধ নিবেদন এই। যে শ্রদ্ধা নিয়ে আপনার কবিতার ক্লাসে আসন নিয়েছি, প্রত্যেক পাঠের পরে সে শ্রদ্ধা ক্রমে বাড়ছে। গত রবিবারের পাঠ শুনে এবং আমার প্রশ্নের উত্তরে আপনার বক্তব্য জেনে আমার ছন্দবোধের কুয়াশা আরও অনেকখানি কেটে গেল। যাঁকে আমি 'কবিঘাতক ছান্দসিক' আখ্যা দিতেও কুণ্ঠাবোধ করিনি, আপনি সেই প্রবোধচন্দ্র সেনের প্রতি খুবই অনুকূল মনোভাব প্রকাশ করেছেন। চটে যেতাম, যদি আপনার সম্বন্ধে অটুট শ্রদ্ধা না থাকত। তাই চটে না গিয়ে তাঁর সম্বন্ধে আমার মনোভাবটা ঠিক কি না তা-ই যাচাই করে দেখতে হল। আপনার শেষ পাঠের সঙ্গে প্রবোধচন্দ্রের 'ছন্দ পরিক্রমা' বইটির মতামতটা মিলিয়ে দেখলাম। অক্ষরবৃত্ত ছন্দ সম্বন্ধে দুইজনের মতের মিল দেখে আমার বক্রোক্তিগুলির জন্য একটু কুণ্ঠাবোধই হল। এই বইটির দ্বিতীয় অধ্যায়ে অক্ষরবৃত্তের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন :

"পশমী শাল গায়ে দিয়ে
গেলাম কাশ্মীরে,
রেশমী জামা-গায়ে শেষে
আগরা এনু ফিরে।"

আপনার দৃষ্টান্তগুলির মিল দেখে অবাক হয়ে গেলাম। দুইজনের হিসাব দেবার রীতিতেও যথেষ্ট মিল। ফলে 'কবিঘাতক ছান্দসিক' (?) সম্বন্ধে নিজেরই সংশয়, মতটা একটু বদলাতে হল। আমারও স্বীকার করতে হল, 'এমন অবস্থাতে পড়লে সবারই মত বদলায়।' কিন্তু একটা জায়গায় একটু খটকা লাগল। রবীন্দ্রনাথের 'বাঁশি' কবিতায় আছে :

"আকবর বাদশার সঙ্গে
হরিপদ কেরানির কোনো ভেদ নেই।"

এখানে 'আকবর' শব্দে আপনি ধরেছেন তিন মাত্রা, 'বাদশার' শব্দেও তাই। 'বাঁশি' কবিতাটি পড়ে আমার মনে হল, ওই দুই শব্দে চার-চার মাত্রাই ধরা হয়েছে। কেননা, ওই কবিতাটিতে 'টিক্‌টিকি', ট্রামের 'খরচা', মাছের 'কানকা', 'আধমরা' প্রভৃতি সব শব্দেরই মধ্যবর্তী হস্‌বর্ণকে একমাত্রা বলে ধরা হয়েছে, কোথাও ব্যতিক্রম নেই। সুতরাং 'আক্‌বর' ও 'বাদ্‌শা' শব্দের ক্‌ ও দ্‌-কে একমাত্রা হিসেবে ধরা হবে না কেন?

সবশেষে বলা উচিত যে, এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য কবিতা-ক্লাসের সহায়তা করা, বাধা সৃষ্টি করা নয়। প্রবোধচন্দ্রও তাঁর 'ছন্দ-পরিক্রমা' বইটির 'নিবেদন' অংশে জিজ্ঞাসু ছাত্রের প্রশ্নকে তাঁর চিন্তার সহায়ক বলেই স্বীকার করেছেন। তাই আশা করি আপনিও আমার প্রশ্নকে সেভাবেই গ্রহণ করবেন। ইতি ২০ আশ্বিন ১৩৭২।

অনুলেখ : আজকের পাঠের একটি দৃষ্টান্ত সম্বন্ধেও মনে একটা প্রশ্ন জেগেছে। সেটাও নিবেদন করি।—

'কালকা মেলে টিকিট কেটে সে
কাল গিয়েছে পাহাড়ের দেশে।'

এটা অক্ষরবৃত্ত রীতিতে পড়তে গিয়ে যতটা কানের সায় পেয়েছি, তার

চেয়ে বেশি সায় পেয়েছি স্বরবৃত্ত রীতিতে পড়ে। এরকম সংশয়স্থলে কী করা উচিত? ইতি ২৩ আশ্বিন ১৩৭২।

কবিকঙ্কণের উত্তর

গত সপ্তাহের রবিবাসরীয় আলোচনীতে 'জিজ্ঞাসু পড়ুয়া'র চিঠি পড়লুম।

(১) তাঁকে যে আমি প্রবোধচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করতে পেরেছি, আপাতত এইটেই আমার মস্ত সাফল্য!

(২) 'ছন্দ-পরিক্রমা' আমি এখনও পড়িনি। পড়তে হবে। ছন্দ নিয়ে যখন আলোচনা করতে বসেছি, তখন প্রবোধচন্দ্রের সব কথাই আমার জানা চাই। শুনেছি প্রবোধচন্দ্র এখন বাংলা কবিতার মূল ছন্দ তিনটির অন্য প্রকার নামের পক্ষপাতী। কেন, তা আমি জানিনে। জানতে হবে। 'ছন্দ-পরিক্রমা' গ্রন্থে ব্যক্ত মতামতের সঙ্গে আমার ধারণার যদি বিরোধ না ঘটে, তবে সে তো আমার পক্ষে পরম শ্লাঘার বিষয়।

(৩) 'বাঁশি' কবিতার লাইন দুটির প্রসঙ্গে জানাই, স্মৃতি আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আমার স্মৃতিতে লাইন দুটির স্বাতন্ত্র্য বজায় ছিল না, তারা এক হয়ে গিয়েছিল, এবং সেইভাবেই, অর্থাৎ টানা লাইন হিসেবে, তাদের আমি উদ্ধৃত করেছিলাম। টানা লাইন হিসেবে গণ্য করলে দেখা যাবে, 'আকবর' ও 'বাদশার'—এই দুই শব্দের কাউকেই তিন-মাত্রার বেশি মূল্য দেওয়া যায় না। দোষ আমার বিচারের নয়, অসতর্কতার।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, "আকবর বাদশার সঙ্গে"—এই লাইনটিকে যদি পরবর্তী লাইনের সঙ্গে জুড়ে না-ও দিই, অর্থাৎ তাকে যদি আলাদাই রাখি, তবে তাতেই কি নিঃসংশয় হওয়া যায় যে, 'আকবর' ও 'বাদশার' —এরা চার-মাত্রারই শব্দ? বলা বাহুল্য, পুরো লাইনটিকে দশ-মাত্রার

মূল্য দিলে তবেই এরা চার-চার মাত্রার শব্দ হিসেবে গণ্য হবে। জিজ্ঞাসু পড়ুয়া সে-দিক থেকে ন্যায্য কথাই বলেছেন। কিন্তু পুরো লাইনটির মাত্রা-সংখ্যা যে দশের বদলে আটও হতে পারে, এমন কথা কি ভাবাই যায় না? যে-ধরনের বিন্যাসে এই কবিতাটি লেখা, সেই ধরনের বিন্যাসে রবীন্দ্রনাথ অনেক ক্ষেত্রে চার-মাত্রা কিংবা আট-মাত্রার লাইন রাখতেন। 'বাঁশি' কবিতাটিতেও আট-মাত্রার লাইন অনেক আছে।

মুশকিল এই যে, "আকবর বাদশার সঙ্গে"—এই লাইনটিও যে সেই গোত্রের, অর্থাৎ আট-মাত্রার, তাও আমি জোর করে বলতে পারছিনে। জিজ্ঞাসু পড়ুয়া এটিকে দশ-মাত্রার মূল্য দিয়েছেন; দিয়ে 'আকবর' এবং 'বাদশার'—এই শব্দ দুটিকে চার-চার মাত্রার শব্দ বলে গণ্য করেছেন। তিনি ভুল করেছেন, এমন কথা বলা আমার পক্ষে অসম্ভব। শুধু অনুরোধ জানাই, তিনিও একবার ভেবে দেখুন, পুরো লাইনটিকে আট-মাত্রার মূল্য দিয়ে, যদি কেউ ওই শব্দ দুটিকে তিন-তিন মাত্রার শব্দ হিসেবে গণ্য করে, তবে সেটা অন্যায় হবে কি না।

জিজ্ঞাসু পড়ুয়া অবশ্য তাঁর সিদ্ধান্তের সপক্ষে একটি জোরালো যুক্তি দিয়েছেন। সেটা এই যে, ওই কবিতাটিতে "সব শব্দেরই মধ্যবর্তী হস্‌বর্ণকে এক-মাত্রা বলে ধরা হয়েছে, কোথাও ব্যতিক্রম নেই।" সুতরাং 'আকবর' ও 'বাদশার' শব্দের মধ্যবর্তী 'ক্' ও 'দ্'-কেও একটি করে মাত্রার মূল্য দেওয়া উচিত।

ঠিক কথা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কি এমন কবিতা লেখেননি, যাতে শব্দের মধ্যবর্তী হস্‌বর্ণ কোথাও-বা মাত্রার মূল্য পায়, কোথাও-বা পায় না? এমন কথা কেমন করে বলি? 'আরোগ্য' গ্রন্থের 'ঘণ্টা বাজে দূরে' কবিতাটি দেখা যাক। সেখানে দেখছি, "হেথা হোথা চরে গোরু শস্যশেষ বাজরার খেতে"—এই লাইনটিতে 'বাজরার' শব্দের মধ্যবর্তী 'জ্'-কে একটি মাত্রার মূল্য দিতে হয় বটে, কিন্তু তার পরের লাইনেই ("তরমুজের লতা হতে") 'তরমুজ' শব্দের মধ্যবর্তী 'র্'-কে মাত্রার মূল্য দিতে হয় না।

বলা বাহুল্য, এতেই প্রমাণিত হয় না যে, 'ঘণ্টা বাজে দূরে' কিংবা অন্যান্য কবিতায় যে-হেতু ব্যতিক্রম আছে, অতএব 'বাঁশি' কবিতাতেও

ব্যতিক্রম আছে, এবং "আকবর বাদশার সঙ্গে"—এই লাইনটিকেও আট-মাত্রার লাইন হিসেবে গণ্য করে 'ক্‌' আর 'দ্‌'-কে মাত্রার মূল্য থেকে বঞ্চিত করতেই হবে। না, এমন অদ্ভুত দাবি আমি করি না। বরং বলি, সম্ভবত জিজ্ঞাসু পড়ুয়ার কথাই ঠিক, সম্ভবত 'আকবর' ও 'বাদশার'—এরা চার-চার মাত্রার শব্দই বটে। কিন্তু একই সঙ্গে অনুরোধ জানাই, অন্য রকমের বিচারও সম্ভব কি না, জিজ্ঞাসু পড়ুয়া যেন সেটাও একবার সহৃদয় চিত্তে ভেবে দেখেন।

ইতিমধ্যে আর-একটা কথা বলা দরকার। অক্ষরে-অক্ষরে অসবর্ণ মিলনের দৃষ্টান্ত হিসেবে জিজ্ঞাসু পড়ুয়ার দরবারে 'আকবর' এবং 'বাদশার' যদি একান্তই পাস্‌-মার্‌ক্‌ না পায়, তা হলে রবীন্দ্রকাব্য থেকেই আর-একটি দৃষ্টান্ত আমি পেশ করতে পারি। 'জন্মদিনে' গ্রন্থের 'ঐকতান' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন "ভালো নয়, ভালো নয় নকল সে শৌখিন মজ্‌দুরি।" 'মজ্‌দুরি' শব্দটিতে 'জ'য়ে 'দ'য়ে অসবর্ণ মিলন ঘটেছে, জিজ্ঞাসু পড়ুয়া এ-কথা আশা করি স্বীকার করবেন। শব্দটিকে কোনও-ক্রমেই তিন-মাত্রার বেশি মূল্য দেওয়া সম্ভব নয়। এমন দৃষ্টান্ত আরও কিছু আমার সংগ্রহে আছে।

(৪) "কাল্‌কা মেলে···পাহাড়ের দেশে"—এই লাইন দুটিকে অক্ষরবৃত্ত রীতিতে পড়ে কানের যতটা সায় পাওয়া যায়, তার চাইতে বেশি সায় যদি পাওয়া যায় স্বরবৃত্ত রীতিতে, তবে তো বুঝতেই হবে যে, শব্দের বিন্যাসে আমার আরও হুঁশিয়ার থাকা উচিত ছিল। প্রসঙ্গত জিজ্ঞেস করি, জিজ্ঞাসু পড়ুয়া তাঁর চিঠিতে প্রবোধচন্দ্রের গ্রন্থ থেকে অক্ষরবৃত্তের দৃষ্টান্ত হিসেবে, যে-দুটি লাইন তুলে দিয়েছেন ("পশমী শাল ···আগরা এনু ফিরে"), তাদেরও কি স্বরবৃত্ত রীতিতে পড়া যায় না? এ-সব ক্ষেত্রে পাঠকের বিভ্রাট ঘটে মূলত শব্দের গাঁটের জন্য। গাঁট-গুলিকে অক্লেশে পেরোতে পারলে যা অক্ষরবৃত্ত, হোঁচট খেলে তাকেই অনেক সময় স্বরবৃত্ত বলে মনে হয়। যদি সম্ভব হয়, এই গাঁটগুলি নিয়ে পরে আলোচনা করব।

ডঃ ভবতোষ দত্তের চিঠি

শ্রীকবিকঙ্কণ সমীপেষু,

সবিনয় নিবেদন, আপনার 'কবিতার ক্লাস'-এর আমি একজন উৎসুক পড়ুয়া। কবিতার ক্লাস প্রায় শেষ হয়ে এল। আপনার শেষের দুটি ক্লাস সম্বন্ধে আমার দু-একটি কথা মনে হয়েছে। নিবেদন করি।

স্বরবৃত্ত ছন্দ যে চার সিলেব্‌ল্‌-এর কম অথবা বেশি স্বীকার করে, এ-কথা আপনি নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন। আপনার দেওয়া দৃষ্টান্ত কয়টি লক্ষ্য করলাম—হয় তারা মৌখিক ছড়া অথবা ইয়ে-শব্দযুক্ত কাব্যপংক্তি। ইয়েকে যুগ্মস্বর ছাড়া কী বলা যায় ইংরেজি ডিপথং-এর মতো। বাংলাতেও ঐ অথবা ঔ-এর মতো। আমার ধারণা, আপনি রবীন্দ্রনাথ অথবা সত্যেন্দ্রনাথের অথবা আধুনিক কোনও কবির কবিতায় চার সিলেব্‌ল্‌-এর ব্যতিক্রম পাবেন না। কিংবা পেলেও সেটা এতই বিরল যে, তাকে স্বরবৃত্ত ছন্দের সাধারণ প্রকৃতি বলে নির্দেশ করতে পারেন না। ছড়ার ছন্দে যে-সব দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, তা যদি এর সাধারণ প্রকৃতিই হত, তবে পরবর্তী আদর্শ শিল্পী-কবিরা তার ব্যবহার নিশ্চয়ই করতেন। তাঁরা চার সিলেব্‌ল্‌-এর পর্বকেই আদর্শরূপে গণ্য করেছেন। তার অর্থ নিশ্চয়ই এই যে, পাঠযোগ্য কবিতায় বাঙালির উচ্চারণ-প্রকৃতি চার সিলেব্‌ল্‌কেই স্বীকার করে মাত্র।

আপনি বলেছেন, স্বরবৃত্ত ছন্দ গানের সুরের ছন্দ। ছড়া ইত্যাদিতে মধ্যযুগে ব্যবহৃত এই-জাতীয় ছন্দকে 'ছড়ার ছন্দ'ই বলা উচিত ; সেকালে একে ধামালী ছন্দ বলা হত। রবীন্দ্রনাথ-সত্যেন্দ্রনাথ-ব্যবহৃত এই ছন্দের আধুনিক শিল্পসম্মত রূপকেই খাঁটি স্বরবৃত্ত বলা উচিত। মধ্যযুগের ধামালী অযত্নকৃত—এর প্রকৃতি সম্বন্ধে কেউ অবহিত ছিলেন না। সে-জন্য তিন সিলেব্‌ল্‌ বা পাঁচ সিলেব্‌ল্‌ নিয়ে কেউ মাথা ঘামাননি।

বিশেষত কোনও বড় প্রধান বা গুরু কাব্যেই এই ছন্দের ব্যবহার নেই।

ছড়া সুরে উচ্চারিত হত, এ-কথা সত্য। আপনি বলেছেন, স্বরবৃত্ত ছন্দ এই জন্যই গানের ছন্দ। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, সুরে গাওয়া বা উচ্চারিত হত না হেন বস্তু মধ্যযুগে ছিল না। বৈষ্ণব পদাবলীর কথা ছেড়ে দিন, বৃহৎকায় মঙ্গলকাব্যগুলিও সুর করে পড়া হত। মঙ্গলকাব্য তো স্বরবৃত্ত ছন্দে লেখা হত না, হত অক্ষরবৃত্ত ছন্দে। কিন্তু এখানেও বলতে পারি, ভারতচন্দ্রের আগে অক্ষরবৃত্ত পয়ার ছন্দেও চোদ্দ অক্ষরের (বা মাত্রার) নানা ব্যতিক্রম হামেশাই দেখা যেত। সে-জন্যে কি বলবেন ব্যতিক্রমটাই সাধু পয়ার রীতির প্রকৃতি? অক্ষরবৃত্তও গানের সুরেরই ছন্দ? এর পরবর্তী সিদ্ধান্ত, ছন্দ মাত্রেই গানের সুর থেকে উদ্‌ভূত। সেটা অবশ্য আলাদাভাবেই আলোচ্য।

স্বরবৃত্ত ছন্দের বিশেষত্ব হচ্ছে এর হসন্ত প্রবণতা। হসন্ত-ধ্বনি থাকার জন্যই শব্দের প্রথমে ঝোঁক পড়ে। শব্দের প্রথম দিকে ঝোঁক এবং শব্দের প্রান্তের হসন্ত-ধ্বনি চলতি ভাষারও বিশেষত্ব। এ বিষয়ে খুব একটা মতভেদের অবকাশ আছে বলে মনে করি না। বস্তুত স্বরবৃত্ত ছন্দের হসন্ত প্রবণতা ভাষার মৌখিক রীতির জন্যই। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

'চলতি ভাষার কবিতা বাংলা শব্দের স্বাভাবিক হসন্তরূপকে মেনে নিয়েছে।'

এটা লক্ষ্য করলে গানের সুর থেকে স্বরবৃত্ত ছন্দের উদ্‌ভব। হয়তো এ-কথা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। চলতি মুখের ভঙ্গি আর সুরের ভঙ্গি সম্পূর্ণ আলাদা বস্তু। একটাতে থাকে ঝোঁক, আর-একটাতে প্রবাহ। ইতি। ২৪.৩.৬৬

কবিকঙ্কণের উত্তর

সবিনয় নিবেদন,

আপনার চিঠি যথাসময়ে পেয়েছি। উত্তর লিখতে অসম্ভব দেরি হল. তার জন্য মার্জনা চাই।...

আপনার প্রতিটি কথাই ভাববার মত। তা ছাড়া, এমন অনেক তথ্য আপনি জানিয়েছেন, যা আমার জানা ছিল না। জেনে লাভবান হয়েছি।

শুধু একটি ব্যাপারে আমার একটু খটকা লাগছে। স্বরবৃত্তে রচিত "পাঠযোগ্য কবিতায় বাঙালির উচ্চারণ প্রকৃতি" যে শুধু চার সিলেব্‌ল-এর পর্বকেই স্বীকার করে, এই সিদ্ধান্তের যুক্তি হিসেবে আপনি জানিয়েছেন, "রবীন্দ্রনাথ অথবা সত্যেন্দ্রনাথের অথবা আধুনিক কোনও কবির কবিতায় চার সিলেব্‌ল্‌-এর ব্যতিক্রম" পাওয়া যাবে না। "কিংবা পেলেও সেটা এতই বিরল যে, তাকে স্বরবৃত্ত ছন্দের সাধারণ প্রকৃতি বলে নির্দেশ" করা উচিত হবে না।

অনুমান করি, আপনি যেহেতু "পাঠযোগ্য" কবিতার উপরে জোর দিতে চান, তাই—ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত হিসেবে—'মৌখিক ছড়া'র দৃষ্টান্ত আপনার মনঃপূত নয়।

এ-বিষয়ে আমার বক্তব্য সংক্ষেপে সবিনয়ে নিবেদন করি।

(১) 'মৌখিক ছড়া'গুলি তো একালে শুধুই মুখে-মুখে ফেরে না, লিপিবদ্ধও হয়ে থাকে। এককালে সেগুলি হয়তো শুধুই কানে শোনবার সামগ্রী ছিল; এখন সেগুলিকে আকছার চোখে দেখছি। এবং পড়ছি। অগত্যা তাদের আর 'পাঠযোগ্য' সামগ্রী হিসেবেও গণ্য না-করে উপায় নেই। তবে আর সেগুলিকে দৃষ্টান্ত হিসেবে ব্যবহার করায় আপত্তি কেন?

(২) 'বাঙালির উচ্চারণ প্রকৃতি'র পক্ষে সত্যিই কি স্বরবৃত্তে শুধুই চার সিলেব্‌ল্‌-এর পর্বকে স্বীকার করা সম্ভব? সর্বত্র সম্ভব? ক্রমাগত

যদি চার চারটি ক্লোজ্‌ড সিলেব্‌ল্‌ দিয়ে আমরা পর্ব গড়তে চাই, পারব কি ?

(৩) রবীন্দ্রনাথ কিংবা সত্যেন্দ্রনাথ স্বরবৃত্তকে প্রধানত কীভাবে ব্যবহার করেছেন, সেটা আমার বিচার্য ছিল না ; স্বরবৃত্তকে কীভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, সেইটেই ছিল আমার দেখবার বিষয়। দেখতে পাচ্ছি, ছয় থেকে ছয়ে এর ওঠানামা। কাজিফুল 'কুড়োতে কুড়োতে' আমরা ছয়ে উঠতে পারি, আবাব 'ঝুপ ঝুপ' করে ছয়ে নামতে পারি। উচ্চারণে যে-ছন্দ ইলাসটিসিটিকে এতটাই প্রশয় দেয়, তাকে ঠিক কবিতার ছন্দ বলতে আমার বাধে। ডিপথং-এর কথাটা আমি ভেবে দেখেছি, কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই ওঠানামার সর্বত্র ব্যাখ্যা মেলে না। বরং সন্দেহটা ক্রমেই পাকা হয়ে দাঁড়ায় যে, নিজেদের অগোচরে পর্বকে কখনও আমরা টেনে বড় করি, কখনও বা অতিদ্রুত উচ্চারণে তাকে কমিয়ে আনি। শব্দের উচ্চারণে হ্রাসবৃদ্ধির এতখানি স্বাধীনতা কবিতার ব্যাকরণ স্বীকার করে কি ?

পরিশেষে বলি, সম্ভবত আপনার কথাই ঠিক। তবু অনুরোধ করি, আমার কথাটাও দয়া করে একবার ভেবে দেখবেন। আপনি সহৃদয় পাঠক। উপরন্তু যুক্তিনিষ্ঠ। সেইজন্যেই এই অনুরোধ।...

সপ্রীতি শুভেচ্ছা জানাই। ইতি।

কবি শ্রীশঙ্খ ঘোষের চিঠি

মাননীয়েষু,

কাজটা কি ভাল করলেন ? এতো সহজেই যে ছন্দ-কাণ্ডটা জানা হয়ে যায়, এটা টের পেলে ছেলেমেয়েরা কি আর স্কুলকলেজের ক্লাস শুনবে ? ক্লাস মানেই তো সহজ জিনিসকে জটিল করে তুলবার ফিকির !

এ-লেখার এই একটি কৌশল দেখছি যে, আপনি শুরু করতে চান সবার-জানা জগৎ থেকে। তাই এখানে 'যুক্তাক্ষর' কথাটিকে ব্যবহার

করতে একটুও দ্বিধা করেননি, দেখিয়েছেন কোন্ ছন্দে এর কীরকম মাত্রামূল্য। বোঝানোর দিক থেকে এ একটা উপকারী পদ্ধতি।

কিন্তু এর ফলে ছোট একটি সমস্যাও কি দেখা দেবে না? যুক্তাক্ষর তো শব্দের চেহারা-বর্ণনা, তার ধ্বনিপরিচয় তো নয়। ছন্দ যে চোখে দেখবার জিনিস নয়, কানে শুনবার—এটা মনে রাখলে ধ্বনিপরিচয়টাই নিশ্চয় শেষ পর্যন্ত আমাদের কাজে লাগবে? যেমন ধরা যাক, 'ছন্দ' শব্দটি। মাত্রাবৃত্তে যুক্ত-অক্ষর দু-মাত্রা পায়। এখন, এ-শব্দটি যদি মাত্রাবৃত্তে থাকে তো দু-মাত্রার মূল্য দেব এর কোন্ অংশকে? যুক্তাক্ষর 'ন্দ'-কে, নাকি রুদ্ধদল 'ছন্'-কে? মাত্রার হিসেবটা কেমন হবে? ১+২ (ছ+ন্দ), না ২+১ (ছন্+দ)? চোখ বলবে প্রথমটি, কান বলবে দ্বিতীয়।

তা হলে দল বা সিলেব্‌ল্ কথাটাকে এড়িয়ে থাকা মুশকিল। কিন্তু বেশ বোঝা যায়, আপনি ইচ্ছে করেই অল্পে অল্পে এগিয়েছেন। স্বরবৃত্ত আলোচনার আগে একেবারেই তুলতে চাননি সিলেব্‌ল্-এর প্রসঙ্গ।

আর সেইজন্যেই মাত্রাবৃত্তের একটি নতুন সূত্রও আপনাকে ভাবতে হলো। শব্দের আদিতে না থাকলে এ-ছন্দে যুক্তাক্ষর দু-মাত্রা হয়। আপনি এর সঙ্গে আরও একটু জুড়ে দিয়ে বলছেন যে, শব্দের ভিতরে থাকলেও কখনও-কখনও যুক্তাক্ষর একমাত্রিক হতে পারে। কোথায়? যেখানে তার ঠিক আগেই আছে হস্‌বর্ণ কিংবা যুক্তস্বর। আপনি বলবেন, 'আশ্লেষ' শব্দের 'শ্লে' আর 'সংশ্লেষ' শব্দের 'শ্লে' মাত্রাবৃত্তে দু-রকম মাত্রা পাচ্ছে। প্রথমটিতে দুই, পরেরটিতে এক। অথবা বলবেন, এ-ছন্দে সমান-সমান হয়ে যায় 'চৈতী' আর 'চৈত্র'।

ঠিক কেন যে তা হচ্ছে, এও আপনি জানেন। জানেন যে, এ-সব ক্ষেত্রে সিলেব্‌ল্ দিয়ে ভাবলে ব্যাপারটাকে আর ব্যতিক্রম মনে হয় না, মনে হয় নিয়মেরই অন্তর্গত। যদি এ-ভাবে বলা যায় যে, মাত্রাবৃত্তে রুদ্ধদল দু-মাত্রা পায়, মুক্তদল এক-মাত্রা—তা হলেই ওপরের উদাহরণগুলির একটা সহজ ব্যাখ্যা মেলে। উদাহরণের দিক থেকে

দেখলে শব্দগুলি তো 'সং+শ্লেষ' 'আস্+লেষ' 'চৈ+ত্রী' 'চৈৎ+র'— এই রকম দাঁড়ায় ?

কিন্তু সেভাবে আপনি বলতে চান না ; চান না যে, সিলেব্‌ল্-এর বোঝাটা গোড়া থেকেই পাঠকের ঘাড়ে চাপুক। যুক্তাক্ষর বলেই যদি কাজ মিটে যায় তো ক্ষতি কী! ফলে আপনি তো দিব্যি টগবগিয়ে চলে গেলেন, কিন্তু ক্লাসে যাঁরা ছন্দ পড়াবেন তাঁদের কী দশা হবে ?

কবিকঙ্কণের উত্তর

প্রীতিভাজনেষু,

শঙ্খ, আপনার চিঠি পেয়ে বড় ভাল লাগল।

সত্যি, আমি ঠিকই করেছিলুম যে, সিলেবিক্ ছন্দ স্বরবৃত্তের এলাকায় ঢুকবার আগে সিলেব্‌ল্-কথাটা মুখেও আনব না। আমার ভয় ছিল, ছন্দের ক্লাসের যারা প্রথম পড়ুয়া, গোড়াতেই যদি 'মোরা' সিলেব্‌ল্ ইত্যাদি সব জটিল তত্ত্ব তাঁদের বোঝাতে যাই, তা হলে তাঁরা পাততাড়ি গুটিয়ে চম্পট দেবেন। কিন্তু 'অক্ষর' সম্পর্কে সেই ভয় নেই। অক্ষর তাঁরা চেনেন। তাই, প্রাথমিক পর্যায়ে, অক্ষরের সাহায্য নিয়ে আমি তাঁদের ছন্দ চেনাবার চেষ্টা করেছি। তবু, তখনও আমি ইতস্তত বলতে ভুলিনি যে, ধ্বনিটাই হচ্ছে প্রথম কথা ; বলেছি যে, চোখ নয়, কানই বড়-হাকিম। এমন কী, এও আমি স্পষ্ট জানিয়েছি যে, অক্ষর আসলে ধ্বনির প্রতীক মাত্র। 'কবিতার ক্লাস'-এর পাণ্ডুলিপি তো আপনি দেখেছেন। অক্ষর ও ধ্বনি বিষয়ক এ সব মন্তব্য নিশ্চয় আপনার চোখ এড়ায়নি।

যুক্তাক্ষরের রহস্যটা আপনি ঠিকই ধরেছেন। এবং যেভাবে সেই রহস্যের আপনি মীমাংসা করেছেন, তাতে সমস্ত সংশয়ের নিরসন হওয়া উচিত। কিন্তু আপনি কি নিশ্চিত যে, 'চৈত্র'কে 'চৈৎ+র' হিসেবে

বিশ্লিষ্ট করেই আপনি নিষ্কৃতি পাবেন? রুদ্ধ সিলেব্‌ল্‌ 'চৈৎ'কে আপনি দু-মাত্রার মূল্য দিচ্ছেন, মুক্ত সিলেব্‌ল্‌ 'র'কে দিচ্ছেন এক-মাত্রার। ফলত, সব মিলিয়ে এই শব্দটি তিন-মাত্রার বেশি মূল্য পাচ্ছে না। আপনার এই হিসেবে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু কারও-কারও হয়তো আপত্তি থাকতে পারে। "মাত্রাবৃত্তে রুদ্ধদল দু-মাত্রা পায়, মুক্তদল একমাত্রা", এই বিধান মেনে নিয়েও তাঁরা প্রশ্ন তুলতে পারেন যে, 'চৈত্র' কি বস্তুত একটি রুদ্ধদল ও একটি মুক্তদলের সমষ্টি? তাঁরা দাবি করতে পারেন যে, 'চৈত্র'কে আসলে চ+ইৎ+র হিসেবে বিশ্লিষ্ট করা উচিত, এবং সেই অনুযায়ী এই শব্দটিকে মোট চার-মাত্রার মূল্য দিতে হবে। (প্রথম ও শেষের দুটি মুক্তদলের জন্য দু-মাত্রা ও মধ্যবর্তী একটি রুদ্ধদলের জন্য দু-মাত্রা।) 'সৈন্য' 'দৈন্য' 'মৈত্রী' 'বৌদ্ধ' ইত্যাদি শব্দের বেলাতেও আপনার হিসেবের বিরুদ্ধে এই একই রকমের দাবি উঠতে পারে। আপনি এদের সৈন্‌+ন, দৈন্‌+ন, মৈৎ+রী, বৌদ্‌+ধ হিসেবে দেখাবেন। তাঁরা দেখাবেন স+ইন্‌+ন, দ+ইন্‌+ন, ম+ইৎ+রী, ব+ উদ্‌+ধ হিসেবে। আপনি এদের একভাবে বিশ্লিষ্ট করবেন: তাঁরা করবেন আর একভাবে।

আমি অবশ্য আপনার পন্থাতেই এ-সব শব্দকে বিশ্লিষ্ট করবার পক্ষপাতী। তার কারণ, আমি জানি যে, যুক্তস্বরের পরে হস্‌বর্ণ থাকলে (সেই হস্‌বর্ণটি যুক্তাক্ষরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকলেও কিছু যায় আসে না) ধ্বনিসংকোচ অনিবার্য হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ এ-তথ্য অনেক আগেই জেনেছিলেন। তিনি ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন যে, মাত্রাবৃত্তে 'পৌষ'কে পুরো তিন-মাত্রার মূল্য দেওয়া চলে না; নইলে, 'চিত্রা' গ্রন্থের 'সিন্ধুপারে' কবিতায় (যা কিনা মাত্রাবৃত্তে লেখা) 'পৌষ'-শব্দটার চল্‌তি বানান ছেড়ে তিনি "পউষ প্রখর শীতে জর্জর···" লিখতে গেলেন কেন? উদ্দেশ্য যে পৌষ-এর উচ্চারণকে আর-একটু বিবৃত করে নিশ্চিন্ত চিত্তে ওকে তিন-মাত্রার পার্বণী ধরিয়ে দেওয়া, তাতে আমার সন্দেহ নেই।

বুঝতেই পারছেন, যুক্তাক্ষর-রহস্যের মীমাংসা যদি আমি সিলেব্‌ল্ ভেঙে করতে যেতুম, তা হলে, প্রসঙ্গত, এ-সব প্রশ্ন উঠত। শব্দের বিশ্লেষণ-পদ্ধতি নিয়ে তর্ক বাধত। ধন্ধ দেখা দিত। ছন্দের প্রথম-পড়ুয়াকে সেই ধন্ধ থেকে আমি দূরে রাখতে চেয়েছি। যেভাবে বোঝালে তাঁরা চটপট ধরতে পারবেন, প্রাথমিক ব্যাপারগুলিকে সেইভাবেই তাঁদের বোঝাতে চেষ্টা করেছি।

বাকিটা আপনারা বোঝান। আপনার ভাষায় 'দিব্যি ঢগবগিয়ে' আমি চলে গেলুম। কিন্তু যাবার আগে, চৌরাস্তায় ডুগডুগি বাজিয়ে যে-সব পড়ুয়া আমি যোগাড় করেছিলুম, আপনাদের ওই ক্লাসঘরের মধ্যেই তাঁদের আমি ঢুকিয়ে দিয়ে এসেছি। এবারে আপনাদের পন্থায় আপনারা তাঁদের গড়েপিটে নিন। আমার পড়ুয়াদের আমি চিনি। তাই হলফ করে বলতে পারি, যে-পন্থাতেই পড়ান, তাঁদের নিয়ে বিন্দুমাত্র বেগ আপনাদের পেতে হবে না।

—